সূচী

কৈফিয়ৎ

আমি মাসিক পত্রে গল্প লিখিতেছি বহুকাল হইতে।

"লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের,
সে কেবল কাগজের রঙিন ফানুস।"

এই কথা বুঝিয়াই আমি এতকাল গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার কল্পনাও করি নাই। ঠিক দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার এক সাহিত্যসেবক বন্ধু অকস্মাৎ এই খেয়ালটা আমার মাথায় সঞ্চারিত করিয়া দেন। তারপরে বহু বিচক্ষণ শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক আমার ভিন্ন ভিন্ন গল্পের প্রতি পক্ষপাত দেখাইয়া গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং আমার কয়েকটি গল্প সংস্কৃত মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকাতে এবং হিন্দি সরস্বতী ও উর্দ্দু আদীব মাসিক পত্রে অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। তাহাতে আমার মধ্যে একটু তৎপরতা জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু নানা গোলমালে এই দুই বৎসর গল্পগুলি আমার পাততাড়ির মধ্যেই শুভ অবসরের প্রতীক্ষা করিয়া নীরব থাকিতে বাধ্য ছিল। সম্প্রতি অবকাশ পাইয়া আমার অল্প গুটিকয়েক গল্প পাততাড়ির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিল। এই গল্পগুলির প্রথমটি "সাহিত্য" ও বাকিগুলি "প্রবাসী" হইতে সংগৃহীত। "অনেক লেখায় অনেক পাতক" সেকথা আমি জানি; তাহার জন্য সকল প্রকার নিন্দা তিরস্কার স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াই আমি সাধারণের সম্মুখে গল্পগুলিকে দ্বিতীয়বার সমুপস্থিত করিলাম।

গল্পগুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—কতকগুলির মধ্যে উর্দ্দু পার্সীর ও কতকগুলির মধ্যে সংস্কৃতের গন্ধ বড় বেশি আছে। যে-সময় যে-ভাবার

চর্চ্চা করিতেছিলাম সেই সময়কার রচনায় সেই নূতন শিক্ষিত ভাষার নেশার ঝোঁক আমার অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহারও একটা উপভোগের দিক আছে বলিয়া পুরাতন লেখা যেমন ছিল তেমনিই প্রকাশ করিলাম।

কলিকাতা
ভাদ্র ১৩১৭

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুষ্পপাত্র

মধুস্রবা

১

গুর্জ্জর প্রদেশের অন্তর্গত কুসুমস্তপুরের রাজা বন্ধুহিত পরমসুখে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। কন্যা মধুস্রবার যত্ন, সেনাপতি বলাহকের শক্রশাসন, সভাকবি ক্ষেমশ্রীর মধুর কাব্যরস রাজাকে চিন্তামুক্ত ও সদানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল।

মধুস্রবার তনুলতায় লাবণ্যললিত পুষ্পশ্রী, ঈষচ্চঞ্চল আয়তনয়নে শুভ্র দুগ্ধনদীর ন্যায় মুগ্ধদৃষ্টি; তরঙ্গায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি ও লীলামধুর গতিভঙ্গীতে তাহাকে ঘনবর্ষার বিদ্যুতপুঞ্জের মতো মনে হইত।

সাগরোপকণ্ঠে রাজসভা—মর্ম্মরমণ্ডিত, মণিবেষ্টিত, উদ্যানশোভিত, সাগরচুম্বিত। দক্ষিণে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল ফেনমাল্যমণ্ডিত ভীমকান্ত সমুদ্র; পূর্ব্বে সাগর-সম্মিলিতা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী বিশাখা; উত্তরে নগরপ্রান্তে মেঘমালার মতো ধূম্রধূসর মুঞ্জকেশ পর্ব্বত; পশ্চিমে এলালিঙ্গিত চন্দন-তরুর উদ্যান। সমুদ্রের গর্জ্জন, বিশাখার গুঞ্জন, মুঞ্জকেশের তরুরাজি-নীলা শ্রী, উদ্যানলুণ্ঠিত মিশ্রগন্ধ [illegible] অত্যন্ত মধুর করিয়া রাখিত; রাজার পার্শ্বোপবিষ্টা মধুস্রবার রূপজ্যোতি রাজসভাকে পূর্ণশ্রী দান করিত।

মধুস্রবার রূপ ও কুসুমন্তপুরীর সংস্থানসৌন্দর্য্যে বহু বীরহৃদয় প্রলুব্ধ হইত; কিন্তু বলাহকের তরবারি সকলকে বিমুখ করিত। রাজা সানন্দচিত্তে ক্ষেমশ্রীর কাব্যরস উপভোগ করিতেন। বলাহকের তরবারি মধুস্রবাকে স্মরণ করিয়া যেমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল, ক্ষেমশ্রীর কাব্যও তেমনই মধুস্রবাকেই আশ্রয় করিয়া সকলের হর্ষ উৎপাদন করিত।

শত্রুমথনকালে বলাহক যে করুণ প্রেমব্যাকুল দৃষ্টিতে মধুস্রবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিত, বলাহকের সেই চকিত দৃষ্টিতে কত প্রেম কত নীরব প্রার্থনা মধুস্রবার চরণে নিবেদিত হইত, তাহা কাহারও অগোচর থাকিত না। শত্রুবিজয়-অন্তে ক্ষেমশ্রীর কবিতায় মুদ্রিত-কমল-বেষ্টনকারী ভ্রমরের মতো যে হর্ষশোকার্দ্র-গুঞ্জনধ্বনি ধ্বনিত হইত, তাহাতে মধুস্রবা বুঝিত, কত প্রেম কত অব্যক্ত ব্যাকুলতা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। যখন বলাহক গর্ব্বোন্নতমস্তকে সভাস্থলে দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিত, "মহারাজ, আপনাদের স্নেহের কবচে আত্মরক্ষা করিয়া আমি আজ জয়ী!" তখন ক্ষেমশ্রী কম্পিতকণ্ঠে হ্রীদীপ্তনয়নে নতমস্তকে গাহিত, "ওগো! তোমার প্রেমে আমি আজ বন্দী।" বন্দীকৃত শত্রুকে রাজসম্মুখে আনিয়া বলাহক যখন বলিত, "মহারাজ, এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি, এখন ইহাকে কি শাস্তি দিব, বলুন।" তখন ক্ষেমশ্রী অশ্রুসজলনয়নে করুণামধুর কণ্ঠে গাহিত "বন্দীর লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দাও, উহাকে প্রেমের শৃঙ্খলে চিরবন্দী কর।" বলাহক যখন শুভারম্ভে দেবদর্শনের ন্যায় চকিতে মধুস্রবার লাবণ্যললিত কৌমারশ্রী একাগ্র নয়নে পান করিয়া লক্ষ্যবেধে প্রবৃত্ত হইত, ক্ষেমশ্রী তখন পুষ্পস্তবকাভিরাম দৃষ্টি দ্বারা মধুস্রবার আরতি করিয়া আসিত। বলাহক চাহিয়া চাহিয়া হাসিত; দেখিতে দেখিতে ক্ষেমশ্রীর চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

২

মধুস্রবার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। বলাহক মধুস্রবার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ, হৃদয়ের শোণিত ব্যয় করিয়া চিরকাল আপনার আদেশপালন করিয়াছি, আজ তাহার পুরস্কার দিন।" ক্ষেমশ্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকণ্ঠে ভয়চকিতচিত্তে বলিল, "মহারাজ, ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়া আজীবন আপনাদের সেবা করিয়াছি,—তাহা স্মরণ করিয়া আজ প্রসাদ ভিক্ষা দিন।"

উভয়েই রাজার প্রিয়। ক্ষেমশ্রী শুধু প্রীতি দিয়াছে; বলাহক ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তিনি সংশয়ভঞ্জনের ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের আশায় মধুস্রবার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মধুস্রবা উভয়কেই প্রীতিমধুর দৃষ্টিতে অভিনন্দন করিতেছে। তখন রাজা বলিলেন "ধরণী ও রমণী বীরভোগ্য; তোমাদের বলের পরীক্ষা হউক।"

বলাহকের মুখচ্ছবি আশায় দীপ্ত হইল; বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। বলাহকের দিকে চাহিয়া মধুস্রবা একটু হাসিলেন; কিন্তু ক্ষেমশ্রীর মলিন মুখের দিকে চাহিতেই সে হাসি ম্লান হইয়া গেল।

ক্ষেমশ্রী বলিল, "মহারাজ, কবি সৌন্দর্য্যের উপাসক, রমণী প্রেমপক্ষ-পাতিনী; আমাদের প্রেমের গভীরতার পরীক্ষা হউক।" মধুস্রবার মধুর দৃষ্টিপাতে ক্ষেমশ্রীর সুন্দর কমনীয় মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলাহক ব্যাকুল হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা বলিলেন, "বলহীন কখনও আত্মরক্ষায় সক্ষম নহে; আমার রাজ্য ও কন্যার রক্ষায় কে সমর্থ?" বলাহক তরবারি কোষমুক্ত করিল, মধুস্রবার স্মিতমধুর মুখের দিকে চাহিল। ক্ষেমশ্রী গাহিয়া উঠিল, "প্রেম দিয়া শত্রু জয় করিব, প্রেমের বলে বলী হইব; স্বার্থই কি পরমার্থ? বিরোধবিক্ষুব্ধ রাজ্য অপেক্ষা নির্ব্বিরোধ তরুতলবাস শ্রেয়ঃকল্প।" এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে যখন মধুস্রবার সদয়দৃষ্টি লাভ করিতেছিল,

সে তখন প্রফুল্ল ও অপরজন বিষণ্ণ হইতেছিল। রাজা বলিলেন, "বলীই আমার কন্যা লাভ করিবে।" বলাহক স্বীয় সৌভাগ্যগর্বে ক্ষেমশ্রীকে বিদ্রূপদিগ্ধ দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করিল। ক্ষেমশ্রী বিনয়নম্র বচনে বলিল, "তবে বলেরই পরীক্ষা হউক।" তখন দম্ভভরে বলাহক অসি গ্রহণ করিয়া ক্ষেমশ্রীকে আহ্বান করিল। ক্ষেমশ্রীর ব্যাকুল দৃষ্টি মধুস্রবার নয়নে সন্নদ্ধ হইল। এতক্ষণ পরে মধুস্রবা কহিল, "এরূপ বলপরীক্ষা ন্যায়সঙ্গত নহে। একজন আজন্মশিক্ষিত অস্ত্রব্যবসায়ী, অপরজন অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ, কবি। এরূপ অসম যুদ্ধে বল অপেক্ষা কৌশলেরই জয় হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। আর অস্ত্রযুদ্ধে একজন হত বা আহত হইতে পারে। তাহাও আমার অনভিপ্রেত।" বলাহক তাহার প্রতি ভর্ৎসনাসূচক দৃষ্টিপাত করিল; ক্ষেমশ্রীর দৃষ্টিতে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। "তবে বাহুযুদ্ধ হউক।" মধুস্রবা তাহাও নিরাপদ মনে করিল না। তখন স্থির হইল, "ভারোত্তোলনের শক্তি দেখিয়া বলের পরিমাপ হউক।"

৩

শরতের কনকাভ উজ্জ্বল রবিকিরণ সভাপ্রাঙ্গনে ব্যাপ্ত হইতে না হইতে সভাগৃহ জনপূর্ণ হইল। বৈতালিক রাজার আগমন ঘোষণা করিল। ক্ষেমশ্রী চিরপ্রথা মতো রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া গান ধরিল; কিন্তু আজিকার গান অতি সংক্ষিপ্ত, অতি করুণ। নহবৎ বাজিয়া উঠিল! রাজাদেশে পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

বলাহক গুরুভারসকল তুলিতে লাগিল। ক্রমশ অধিকতর গুরুভার তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে, আর সে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বলাহক একটি ভার বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া আর তুলিতে পারিল না।

এখন ক্ষেমশ্রীর পালা। ক্ষেমশ্রীর সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ শারদ

প্রভাতের মতো গম্ভীর সৌন্দর্য্যে পূর্ণ! সে অগ্রসর হইল। শত সহস্র চক্ষু সেই অক্ষমের উপর করুণা ও মঙ্গলেচ্ছা বৃষ্টি করিতে লাগিল। ক্ষেমশ্রী একবার সাগরের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল, একবার বিশাখাকে দেখিল, একবার মুঞ্জকেশ পর্ব্বতের দিকে চাহিল, একবার এলালিঙ্গিত চন্দনতরুশ্রেণী দেখিয়া লইল,—সর্ব্বশেষে মধুস্রবাকে দেখিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাহার পর পদপ্রান্তপতিত সেই গুরুভার দুইহস্তে ধারণ করিয়া দ্রুতহস্তে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল।

ক্ষেমশ্রীর জয়ে সভায় হর্ষকোলাহল উত্থিত হইল; সভাজনের দৃষ্টির আঘাতে বলাহকের পরাজয় সহস্রগুণ তীব্র হইয়া উঠিল। লজ্জায় বলাহক ঘর্ম্মাক্তবদন, পাংশুবর্ণ, মৃত্তিকাবদ্ধদৃষ্টি। রাজা বলিলেন "সাধু ক্ষেমশ্রী! সাধু! তোমার প্রেমের জয় হইয়াছে! গুরুভার আর ধারণ করিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, ফেলিয়া দাও।"

জয়োল্লসিত কবির কর্ণে সে কথা প্রবেশ করিল না। কবি মধুস্রবার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, গুরুভার প্রস্তর মাথার উপর ধরিয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান। চারি দিক হইতে ধ্বনি উঠিল "ফেল, ফেল, প্রস্তর ফেলিয়া দাও।" কবির মুখ হাস্যদীপ্ত, চক্ষু মধুস্রবার প্রতি নিবদ্ধ, হস্তে গুরুভার। কবি অবিচল, অকম্পিত। মধুস্রবা বলিলেন, "কবির হাত হইতে প্রস্তর নামাইয়া দাও।"

অমনই কয়েক জন লোক অগ্রসর হইয়া কবির হস্তধৃত প্রস্তর আকর্ষণ করিল। সে আকর্ষণে ক্ষেমশ্রীর প্রাণহীন দেহ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ ভূমিতলে পতিত হইল।

বিজয়দৃপ্ত কবির এই অপূর্ব্ব তিরোধান রাজসভার আনন্দকোলাহলের উপর মরণের করুণগম্ভীর একখানি কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল। মধুস্রবা তাহার পণজেতা স্বামীর এই মহিম-পণ্ডিত মৃত্যুতে হর্ষশোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছায় শান্তিলাভ করিল।

সরমের কথা

আবাহন

সে আজ ২০।২৫ বৎসরের কথা। তখনই আফ্রিদি ও ওয়াজিরি-দিগের উৎপাত ব্রিটিশ সীমান্তে কিছু অধিক আরম্ভ হইয়াছিল। এই সীমান্ত-উৎপাত নিবারণের জন্য সীমান্তপ্রদেশের স্থানে স্থানে ব্রিটিশ সেনা-নীর অধীনে কতকগুলি সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। এইরূপ একটি ক্ষুদ্র আড্ডার ভারপ্রাপ্ত সেনানী ছিলেন গ্রিয়ারসন। আফ্রিদি ও ওয়া-জিরিদিগকে সারাদিনই কিছু তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতে হইত না; কারণ, তখনই তাহারা ব্রিটিশ বলকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিল। এই হেতু গ্রিয়ারসন সাহেবের প্রভূত অবসর ছিল। তাঁহার অবসরকালের অধিকাংশই পান, ভোজন ও ধূমপানেই অতিবাহিত হইত; যদি এই সমস্ত ব্যাপারের পরেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট অবসর পড়িয়া থাকিত, তিনি শিকার করিয়া, ঘোড়া চড়িয়া তাহাও নির্ম্মূল করিয়া ছাড়িতেন। গ্রিয়ারসনের বয়স বত্রিশের অধিক নহে; আজও তিনি অবিবাহিত। গ্রিয়ারসনের উজ্জ্বল নীলাভ চক্ষু দুটিতে কেমন একটু সহজ হাসি সদাই ফুটিয়া রহিত; পানাধিক্যে তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত। কিন্তু অত্যধিক পান ভোজন সত্ত্বেও গ্রিয়ারসন অকর্ম্মা ছিলেন না; আবার তাঁহাকে এরূপও বলিতে শুনা যাইত যে রমণীর সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াই তিনি এরূপ হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রিয়ার-সনের ভালবাসা-প্রবণ প্রাণটা ভালবাসিবার জন্য ব্যগ্র থাকিলেও, তাঁহার আকুলতা-ভরা সমগ্র ভালবাসাটা একটা টেরিয়র কুকুর, একটা আরবী ঘোড়া ও বন্দুক তরবারির উপর ন্যস্ত হইয়াই বোধ হয় একরূপ সন্তুষ্ট ছিল;

কারণ, তাঁহাকে কখনও প্রেমগাথা লিখিতে দেখা যায় নাই, এমন কি কাগজ কলমের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধটা তাঁহার বড়ই কম ছিল।

এহেন গ্রিয়ারসন সাহেব একদিন তাঁহার ক্ষুদ্র বাংলার বাহিরে একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপানে রত আছেন; বামহস্তধৃত সোলা-হ্যাট্‌টা চেয়ারের পার্শ্বে ঝুলিয়া রহিয়াছে; টেরিয়র কুকুরটা সম্মুখে হাতের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। ইহা বাংলার পশ্চাৎ ভাগে। বাংলার সংলগ্ন একটি অতি ক্ষুদ্র বাগান; দুই চারিটা ক্রোটনের গাছের মাঝে মাঝে গোলাপের ঝাড়, তাহাতে গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে; বাগানের মাঝখানে একটা অরোকেরিয়া বৃক্ষ সরল দেহযষ্টি হইতে সরল শাখা বিস্তার করিয়া মন্দিরচূড়ার আকার ধারণ করিয়াছে; কতকগুলা বন্য পার্ব্বত্য ফুলের গাছ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বাগানের এক পার্শ্বে লতাসমাবৃত নাতিক্ষুদ্র লতাবিতানাচ্ছাদিত কুঞ্জবাটিকা, তাহাতে একটি শ্বেত প্রস্তরের চৌকী পাতা রহিয়াছে। বাগানের বেড়া হইতে এক রশি আন্দাজ দূরে একটি বিস্তৃত ঝিল, ঝিলের পশ্চাতে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী; পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া একটি নির্ঝরিণীর শুভ্র কলেবর দূর হইতে রজত-ধারার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে; যেন ধূর্জ্জটির পিঙ্গলজটাকলাপভ্রষ্ট জাহ্নবী-প্রপাত; পর্ব্বত ধূর্জ্জটির মতো ধ্যানস্তিমিত লোচনে স্তব্ধ গম্ভীরভাবে একমনে তাহাকেই দেখিতেছে।

বেলা অবসানপ্রায়; সূর্য্য পর্ব্বতপার্শ্বে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িতেছে; আরক্তিম করজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝিলের জলের মাঝে মাঝে টুকরা টুকরা পড়িয়া জ্বলিতেছে; পর্ব্বতগাত্র হইতে ঘন বন ঝিলের প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বনের শীর্ষদেশ স্বর্ণকিরীটী হইয়া হাসিতেছে। জলে নানাজাতীয় জলচর পক্ষী বেলাবসানে কলকাকলী ধীরপবনে ছড়াইয়া দিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে; বারিকণবর্ষী তৈলনিষেক-চিক্কণ পক্ষগুলিতে সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন রৌদ্রের টুকরা মাঝে মাঝে জ্বলিয়া

উঠিতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ারসনের চক্ষুও৺কি এক আনন্দে হাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। সাহেব ভাবিতেছেন, আজ তোমাদের দুই চারি-টাকে উদরে রাখিয়া তৃপ্তিলাভ করিব; এক্ষণে চুরুটটা নিঃশেষে ভস্ম পরিণত হইলেই হয়। 'হাভানা সিগারের' মায়া কি ছাড়া যায়!

গ্রিয়ারসন এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময়ে একজন সিপাহি দৌড়িয়া আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল, 'হুজুর, ওয়াজিরিলোগ আতা হায়'। সাহেব ত্রস্তভাবে চেয়ার ত্যাগ করিয়া টুপিটা মাথায় দিয়া সিপাহীকে বলিলেন 'ঘোড়া'। সিপাহী চলিয়া গেল; সাহেব চুরুটটির প্রতি একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন এখনো তাহার অর্দ্ধেকটা আছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া চুরুটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত গৃহে প্রবেশ করিলেন। একটা পেরেকের গায় একটা তুরী ঝুলানো ছিল; তাহা লইয়া তিনবার বাজাইলেন; তাঁহার আড্ডাস্থ সিপাহীগণ উহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া সজ্জিত হইল। তিনি তরবারি ও বন্দুক এবং একটা বাঁশী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বাহিরে ৫০।৬০ জন সিপাহী একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রস্তুত করিয়া দণ্ডায়-মান রহিয়াছে; গ্রিয়ারসনের ঘোড়া অস্থিরভাবে প্রভুর প্রতীক্ষা করিতেছে। সাহেব আসিয়াই এক লম্ফে অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং ক্ষণকাল মধ্যে বাহিনী সংযতভাবে সজ্জিত করিয়া লইয়া ওয়াজিরি-যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

ওয়াজিরিগণ দুর্দ্ধর্ষ বীর হইলেও ইংরাজের বাহিনীকে ভয় না করে এমন নহে। তাহারা যেমন একপক্ষে পশুবলে বলী, অপর পক্ষে তেমনি পশুবৎ পলায়নে পটু। তাহারা খুব আবশ্যক বোধ না করিলে ব্রিটিশ-অধিকারে পদার্পণ করিয়া আপনাদিগকে বিপন্ন করিতে চাহে না। তাহাদের নিবাসস্থান পর্ব্বতশৃঙ্গ; সেখানে আহার্য্য দ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব; এজন্য তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে খাদ্য আহরণের জন্য সমতল ভূমিতে নামিতে হইত; পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত যতদূর সম্ভব ব্রিটিশ অধিকার

বিস্তৃত; নিম্নাবতরণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকারে খাদ্য সংগ্রহ ভিন্ন তাহাদের উপায়ান্তর নাই। তাহাদের মুদ্রা নাই; পার্ব্বত্য ছাগলের চর্ম্ম, খনিজ বস্তু প্রভৃতির বিনিময়ে তাহাদের খাদ্য ক্রয় করিতে হয়; কিন্তু সব সময়ে এরূপ বিনিময় সহজসাধ্য হয় না। ছাগলের চামড়া সকলে লইতে চাহে না, লইয়া কি করিবে বলিয়া; খনিজ বস্তুও সকলে লইতে চাহে না, মূল্য-বান দ্রব্য কি মাটি পাথর, বুঝা কঠিন বলিয়া। এজন্য তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল দ্রব্যের বিনিময়ে কেহ কিছু বিক্রয় করিতে সম্মত হয় না। ইহাতে তাহাদের অনর্থক বিলম্ব ও কষ্টভোগ করিতে হয়; সুতরাং তাহারা 'জোরজবরদস্তি' আরম্ভ করিয়া পুলিশের নজরে পড়ে। তৎপরে তাহারা পুলিশকে ফাঁকি দিয়া দল বাঁধিয়া হঠাৎ আসিয়া গ্রাম বাজার লুট করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; গরু, ঘোড়া, উট যাহা পাইত তাহাই আপনাদিগের ব্যবহারের জন্য লইয়া পলাইত। উৎপাত নিবারণ পুলিশের অসাধ্য হইয়া পড়িলে স্থানে স্থানে ব্রিটিশ সেনানীর অধীনে কতকগুলি সৈন্য শান্তিরক্ষার জন্য নিয়োজিত হইল। এইরূপেই সীমান্ত গোলযোগের সূত্রপাত। অতঃপর ওয়াজিরি বেচারিদিগের এরূপ অবস্থা হইয়া পড়ি-য়াছে যে খাদ্য আহরণের জন্য মাঝে মাঝে দুই চারিটিকে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ দিয়া যাইতেই হয়। ওয়াজিরিগণ কোনো অসুবিধা বোধ করিলেও মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের আবাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। পুত্রকলত্রাদি সঙ্গে করিয়া উষ্ট্র ও অশ্বারোহণে সমস্ত গৃহস্থালী লইয়া যাত্রা করে। পর্ব্বতে পর্ব্বতে যাওয়া অসম্ভব, এজন্য তাহারা সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়া বিব্রত হয়। ওয়াজিরিগণ যে কোনো উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সীমান্তে পদার্পণ করুক না কেন তাহাদিগকে নিগৃহীত হইতেই হয়। গ্রিয়ারসন সাহেব চুরট টানিতে টানিতে যাহাদের সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহারা লুণ্ঠন করিতে আসে নাই, তাহারা পুরাতন আবাস ত্যাগ করিয়া নূতনের অন্বেষণে যাইতেছিল।

বাংলা হইতে মাইল খানেক দূরে একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী কুলকুল-স্বরে বনস্থলীকে ঘুম পাড়াইয়া সিন্ধু নদের উদ্দেশে অভিসারিকা হইয়াছে; সে ভাব দেখিয়া দুই চারিটা বনফুল হাসিয়া উঠিয়াছে; মৃদু পবনহিল্লোল তাহার সুগন্ধি পক্ষ বিধূনন করিয়া ফুল কোথায় লুকাইয়া আছে জানাইয়া দিতেছে; তাহাতে সুরভিত বনস্থলী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিয়া হাসিয়া নড়িয়া উঠিতেছে। এমন সময়ে বনের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অনেকগুলা বন্দুক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'গ্রিয়ারসন সাহেব ওয়াজিরিদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন'। ওয়াজিরিদিগের সহিত স্ত্রীপুত্রপরিবার ও গৃহস্থালীর দ্রব্যাদি; তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংরাজের গুলিতে কতক হত ও আহত হইল, যাহারা পারিল পলায়ন করিল। একটি উষ্ট্রে একজন সর্দ্দার একটি যুবতীকে লইয়া যাইতেছিল; উষ্ট্র ও সর্দ্দার গুলির আঘাতে মরিয়া গিয়াছে; যুবতী উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। গ্রিয়ারসনের তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহা দেখিয়াছিল; তিনি সৈন্যদিগকে পলায়নপর ওয়াজিরিদিগের পশ্চাদ্ধাবন হইতে বিরত করিয়া, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুবতীর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন যুবতী সুন্দরী। যুবতীর মুখে জল দিয়া ও তাহাকে বীজন করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল; চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সাহেবের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিল; সাহেবের নীল চক্ষুদ্বয় হাসিয়া ভাসিয়া উঠিল। যুবতী ধীর কণ্ঠে কহিল, "পিয়াস"। চক্ষু পুনরায় নিমীলিত হইল। সাহেব পত্রপুটানীত বারি তাড়াতাড়ি তাহার রক্তাধরে সিঞ্চন করিলেন; যুবতী পান করিয়া সাহেবের সাহায্যে উঠিয়া বসিল। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গীরা ত তোমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তুমি কোথায় যাইবে?" যুবতী ধীরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কলনাদিনী খরতোয়া স্রোতস্বিনী দেখাইয়া দিল। সাহেব কহিলেন—"ছি, মরিবে কেন? আমার সহিত চল; আমার আজও 'সাদি' হয়

নাই; তোমার যদি ইচ্ছা হয় ত' তোমায় আমি 'সাদি' করিব।" যুবতীর বদন শান্ত, গম্ভীর, অথচ চিন্তারেখাসঙ্কুল। অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া একটু ইতস্তত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই বিপদের সময় সাহেবের সস্নেহ মধুর বচন ও ব্যবহার বোধ হয় তাহার প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল; তাই সে সাহেবের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব তাহার হাত ধরিয়া অতীব সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "ঘোড়ায় উঠ।" যুবতী উঠিতে যাইতেছে এমন সময়, একটি আহত ওয়াজিরি আপনাকে কিঞ্চিৎ উত্থিত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "শত্রুর সঙ্গে যাইয়ো না; আপনার জাতির সরমের কারণ হইয়ো না; দরিয়ায় ডুবিয়া মর।" যুবতী একবার তাহার দিকে ফিরিয়া দেখিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল, গ্রিয়ারসন উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময় সে ব্যক্তি "শুনিলে না, তবে জহন্নামে যাও" বলিয়া একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। ভাগ্যক্রমে তাহা কাহাকেও না লাগিয়া একটা সিপাহির পাগড়ী উড়াইয়া দিল, এবং সেই সিপাহি ইহার প্রতিদানস্বরূপ তাহার মস্তকটাই উড়াইয়া দিল।

গ্রিয়ারসন যুবতীসহ এক অশ্বে চলিলেন; তিনি অগ্রে যুবতী পশ্চাতে। যাইতে যাইতে গ্রিয়ারসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেয়ারে, তোমার নাম কি?" যুবতী ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল, "করিমা"।

সপ্তমী

করিমা-বিবি, সাহেবের গৃহে আসিয়া একখানা সাবান ক্ষয় করিয়া গাউন পরিয়াছে। পোষাকটা তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদের কতকটা অনুরূপ হওয়ায় তাহার বিশেষ কোনো অসুবিধা বোধ হয় নাই। কিন্তু টেবিলে কাঁটা চামচে ধরিয়া আহার অভ্যাস করাইতে গ্রিয়ারসনকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। দুই তিন সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টায় করিমা কতকটা অভ্যাস করিয়া আনিয়াছে। ইংরাজী ভাষা ও কায়দা

শিখিতেছে। ওয়াজিরি-কন্যা অশ্বারোহণে পূর্ব্বাপরই সুপটু; এপক্ষে সাহেবের পরিশ্রমের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল।

মাসান্তে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত করিমা সাহেবের সহিত এক বাংলাতে থাকিয়াও ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপন করিত; শয়নকাল ভিন্ন অন্য সমস্ত সময়েই করিমা সাহেবের সহিত যাপন করিয়া সুখী হইত। একমাসের একত্রাবস্থানে করিমা তাহার বিপদের কাণ্ডারী গ্রিয়ারসনকে প্রগাঢ় ভালবাসিয়াছে; সাহেবের নীলাভ স্বচ্ছ চক্ষুদুটি তাহার প্রাণে তীব্র বাসনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সাহেবও করিমার তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি, সুন্দর মুখখানি, দীর্ঘ কেশরাশি ও কুঞ্চিত ভ্রূযুগের মধ্যে একটা লাবণ্যের খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

করিমার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ; তাহার উজ্জ্বল বড় চক্ষু দুটি যেন হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া একই নিশ্বাসে সেখানকার সমস্ত ভাষা পাঠ করিয়া ফেলিত। সে তাহার মেধা লইয়া একমাসের মধ্যে সাহেবী ধরণ অনেকটা শিখিয়া লইয়াছে; দুই চারিটা ইংরাজি কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে,—সাহেবের সাহচর্য্যও তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

আজ বিবাহের দিন। রাত্রি প্রভাতপ্রায়; প্রাচীমুখ হাসিয়া উঠিয়াছে; দোয়েল, বুলবুল জাগিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে; সে-গান শুনিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা প্রফুল্লতর হইয়া উঠিয়াছে। করিমা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে; একটি শাদা রেশমী গাউন পরিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া, ফুলের একটি ক্ষুদ্র গুচ্ছ আলুলায়িত কেশপার্শ্বে বিদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। সম্মুখে বৃহৎ মুকুর; মুকুরে প্রতিফলিত চক্ষের প্রতিবিম্বে কত আশা, কত বাসনা, কত সুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। ঘরটি শান্ত, স্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ; করিমার সুন্দর মুখখানি থাকিয়া থাকিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল, ঘরটিতে উষার প্রথমোন্মেষিত স্নিগ্ধ আলোক আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া লুটিতেছিল। আজ করিমার সমস্তই সুন্দর বোধ হইতেছে।

গ্রিয়ারসন সাহেবও সজ্জিত হইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে ধূমপান করিতেছেন, টেরিয়র কুকুরটা পাপোষের উপর পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। গ্রিয়ারসনেরও বদন প্রফুল্ল, দীপ্ত।

সূর্য্যোদয়ের পর বিবাহক্ষণ স্থির হইয়াছে। করিমা তাহার মহম্মদীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায় না; গ্রিয়ারসন তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, অনেক যুক্তি দেখাইয়াও লওয়াইতে পারেন নাই। করিমা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীকে বিবাহ করিতে আপত্তি করে না, কারণ সে মৌলবীর মুখে শুনিয়াছে যে "ইঞ্জিল এবং তওরয়েৎ ফোরকান ধর্ম্মেরই শাখাবিশেষ"; তথাপি তাহার একান্ত আগ্রহ যে বিবাহটা মুসলমান পদ্ধতিতেই হয়; গ্রিয়ারসন একটু ইতস্তত করিয়া তাহাতেই সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। রূপ যে বড় বালাই!

গ্রিয়ারসন অগত্যা স্বীকার করিলেও তাঁহার ইহা ইচ্ছা নহে যে লোকে জানিতে পারে তাঁহার মহম্মদীয় প্রথায় বিবাহ হইতেছে। এই হেতু তিনি মোল্লা প্রভৃতি ডাকিয়া লোক জানাজানি করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাঁহার সৈন্যদলে একজন মুসলমান সহিস ছিল; তাহার বয়স চল্লিশোর্দ্ধ হইবে; সৌভাগ্যক্রমে তাহার দীর্ঘ শ্মশ্রুও ছিল। গ্রিয়ারসন সেই কৃষ্ণশুভ্রশ্মশ্রুসমন্বিত দীর্ঘায়ত সহিসকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিবেন স্থির করিয়া, রাত্রে তাহাকে স্বীয় কামরায় আহ্বান করিলেন। সহিস রমজান অসময়-আহ্বানে ভীতচিত্তে আসিয়া খুব সম্ভ্রমসহকারে সেলাম করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইল। সাহেব তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া পকেট হইতে একমুঠা টাকা উঠাইয়া পাপোষের উপর ফেলিয়া দিলেন, অধিক শব্দ হইল না—তাঁহার তাহাই ইচ্ছা। রমজান সাহেবের হস্তসঞ্চালন-ব্যাপার দেখিয়া মনে করিয়াছিল তাহার মস্তক বা প্লীহা বিদীর্ণ করিবার জন্যই বুঝি কোনো অভিনব আয়ুধ প্রেরিত হইতেছে; সে ভীত ত্রস্তভাবে বিচলিত হইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল

কিন্তু এক্ষণে অস্ত্রের পরিবর্ত্তে মুদ্রার মুখাবলোকন করিয়া আপনার নসিবের তারিফ করিতে করিতে খোদা ও সাহেবকে সেলাম করিয়া মুদ্রাকয়টা হস্তগত করিল। সাহেব এখনও নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতেছেন, ঘরের কোণে একটা বাতি অমনি একরকম হাসিয়া হাসিয়া জ্বলিতেছিল।

দণ্ডেক পরে সাহেব রমজানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; সে বেচারা আবার সেলাম করিল। সাহেব চুরটের ছাই ঝাড়িয়া, একটু কাশিয়া কহিলেন, 'দেখ রমজান, তোমায় একটা কাজ করিতে হইবে।' রমজান সাহেবের প্রকৃতিপরিবর্ত্তন দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল ; এত আদর সে কখনো পায় নাই ; আবার সেলাম করিয়া কহিল, 'হুজুর, তাবেদার হামেশা হাজির আছে, সে জান কবুল করিয়া হুকুম তামিল করিবে।" সাহেবেরা এদেশীয়কে আজও চিনিতে পারেন নাই ; তাহাদের প্রাণের কথা বুঝিতে পারেন নাই ; তাই তাহাদিগকে ঘৃণা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। তাবেদার নেটিভেরা দুইটা মিষ্টকথা, একটু সদয় ব্যবহারেই পরিতৃপ্ত হইয়া অনেক সময়ে যে জান কবুল করিয়া হুজুরের হুকুম তামিল করে তাহা তাঁহারা ভক্তির প্রতি আরোপ না করিয়া বহুস্থলে লোভের উপরই ন্যস্ত করিয়া থাকেন। গ্রিয়ারসনও স্বদেশীয় শিক্ষা দীক্ষায় স্বজাতীয় সৌসাদৃশ্য রাখিয়া একটু হাসিলেন, তিনি রমজানের কথাগুলিকে অর্থের প্রতিদান বলিয়া গ্রহণ করিলেন। গ্রিয়ারসন দুইবার চুরট টানিয়া বলিলেন, "রমজান, আমি সাদি করিব।"

রমজান উৎফুল্লভাবে বলিল, "মেমসাহেব কবে এখানে আসিবেন ?"

গ্রিয়ার। মেম সাহেব ত আমার কুঠিতেই আছেন ; আমি করিমা বিবিকে সাদি করিব।

রমজান অবাক হইয়া গেল। সামান্যা ওয়াজিরি-কন্যা করিমা কর্ণেল সাহেবের 'ঘরাণা' হইবে, ইহা তাহার নিকট একটি বিষম সমস্যারূপে

প্রতিভাত হইতেছিল। করিম্ন যদিও সাহেবের গৃহে কর্ত্রীরূপেই অবস্থান করিতেছিল, তথাপি সাহেবের পরিচরবর্গ তাহাকে সাহেবের বিশেষ অনুগৃহীতা ভিন্ন অন্যরূপে জানে নাই। রমজানকে নির্ব্বাক দেখিয়া গ্রিয়ারসন বলিতে লাগিলেন, "রমজান তোমাকেই আমার বিবাহের মোল্লা হইতে হইবে। আমি তোমাদের ইস্লাম-ধর্ম্মানুমোদিত প্রথায় বিবাহ করিব, কিন্তু নির্ব্বোধ মোল্লা ডাকিয়া আমি লোক জানাজানি করিতে চাহি না। কেমন, তুমি পারিবে ত?"

রমজানের মুখ শুষ্ক, জিহ্বা রসশূন্য, চক্ষু দৃষ্টিহীন, হৃদ্যন্ত্র স্থির হইয়া আসিল। সে অতি কষ্টে অতি ধীরবচনে কহিল, "হুজুর, আমি মন্ত্র জানি না।"

গ্রিয়ার। তুমি নামাজ কর?

রমজান। করি।

গ্রিয়ারসন অল্প হাসিয়া কহিলেন, "তবে আর কি, তুমি নমাজের মন্ত্র পড়িয়াই আমাদের বিবাহ দিবে। বিবি স্ত্রীলোক, সে ইহার কিছুই বুঝিবে না।"

রমজান করজোড়ে কহিল, "হুজুর আমাকে মাপ করিবেন; আমি ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়া 'গুণা' করিতে পারিব না।" রমজানের প্রাণের ভিতর দুর দুর করিয়া কাঁপিতেছিল।

গ্রিয়ারসন একটু রুক্ষস্বরে কহিলেন, "আমার হুকুম, তোমাকে পারিতে হইবে। নমাজের মন্ত্রের সহিত দুই একটা বয়েৎ গাহিয়া দিও, তাহা হইলেই হইবে; কিন্তু দেখিও যেন বয়েৎগুলি সঙ্গত হয়, ওয়াজিরি করিমা পারসী আরবী অনেকটা বুঝিতে পারিবে।"

এই বলিয়া আবার কতকগুলি মুদ্রা রমজানের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; রমজান দিরুক্তি করিতে সাহস না করিয়া ভারাক্রান্ত চরণ ও মন লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। সাহেব ঘড়ি দেখিলেন, চারিটা বাজিয়াছে।

শামাদানে বাতিটার আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছিল, নিবিয়া গেল, সাহেব অন্ধকারেই বসিয়া রহিলেন।

রমজান গৃহে যাইয়াই একটি শুভ্র চাপকানের উপর সদ্‌রী গায়ে দিল; মাথায় বেশ করিয়া একটি বৃহৎ আয়তনের পাগড়ি বাঁধিল; পায়ে এক জোড়া দিল্লীবাল জুতা পরিয়া তাহার বন্ধু ইসাকের বাড়ী যাইয়া বহু ডাকাডাকিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। রমজান রাত্রের সমস্ত ঘটনা কহিয়া বিস্মিত বন্ধুকে কিছু আশ্বস্ত করিয়া কহিল, "ভাই, আমাকে তুই একটা বিবাহোপযোগী বয়েৎ শিখাইয়া দিতে হইবে, নহিলে কর্ণেল সাহেব আমার জান লইবে।"

ইসাক কহিল, "গৃহে এস, কেতাব দেখিয়া বলিয়া দিব।" ইসাক একটু আধটু বিদ্যাচর্চ্চা করিয়াছিল। রমজান ইসাকের সহিত গৃহে প্রবেশ করিল।

এদিকে গ্রিয়ারসন সাহেবের অন্ধকারে চিন্তা করিতে করিতে একটু সুষুপ্তি আসিয়াছিল। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, করিমা শুভ্র রেশমী পরিচ্ছদে একটি দেবীপ্রতিমার মতো তাঁহার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; সে যেন কোন স্বপ্নময় পুষ্পরাজ্য হইতে কোন শুভলগ্নে খসিয়া পড়িয়াছে। গ্রিয়ারসন চেয়ারের উপর দিয়া পশ্চাৎ দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া করিমার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, করিমা সেই স্নেহ-আকর্ষণে ভ্রমরভারে ফুলকলিকার মতো কিঞ্চিৎ আনত হইয়া পড়িল।

গ্রিয়ারসন ও করিমা উভয়ে উভয়ের সাহায্যে উভয়ের ভাষায় অল্পাধিক শিক্ষিত হইয়া খেয়াল মতো উভয় ভাষার সংমিশ্রণে বা উর্দ্দুতে কথোপকথন করিতেন। যে স্থলে একের ভাষা অন্যের নিকট দুর্ব্বোধ বা কষ্টবাচ্য হইয়া উঠিত, তখনই খাস উর্দ্দুর শরণ লওয়া হইত, অন্যথা মিশ্রভাষারই প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রহিত। করিমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই গ্রিয়ারসন

পারস্য কবি সাদির 'করিমা' নামক পুস্তকের প্রথম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া করিমার সম্বর্দ্ধনা করিতেন। করিমাকে বাহুবেষ্টনে বদ্ধ করিয়া গ্রিয়ারসন হাসিয়া কহিলেন—

"করিমা ববখ্‌শয়্‌ বর্‌ হালেমা,
কে হস্তম্‌ আসিরে কমন্দে হাওয়া।
নদারেম গয়রজতো ফরিয়াদ্‌ রস্‌,
তুয়ি আঁসিয়ারা খতা বকশ্‌ও বশ।
নেগেহ্‌দার মারা জেরা হে খতা,
খতা দরগুজারো সওয়াব অমনুমা"।*

করিমা হাসিয়া কহিল, "পেয়ার, সমস্ত রাত্রিই চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়াছ ?"

গ্রিয়ারসন কহিলেন, "হাঁ ডার্লিং, রাতটা বড়ই দীর্ঘ। প্রিয়তমে, আজ সমস্ত বাধা, আবরণ অপসারিত হইবে; আইস আমার হৃদয়েশ্বরী।" এই কথা বলিয়া গ্রিয়ারসন গ্রীবা উন্নমিত করিয়া করিমার মুখচুম্বনের উপক্রম করিলেন। প্রাচ্যসতীত্বগর্ব্বিতা করিমা হাসিয়া মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, "আমি এখনও তোমার হই নাই।"

গ্রিয়ারসন একটু অপ্রতিভ হইয়া, একটি রজত ঘণ্টায় শব্দ করিলেন। ভৃত্য আসিল। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোল্লা আসিয়াছে ?" শিক্ষিত ভৃত্য উত্তর দিল, "আজ্ঞা, হাঁ হুজুর।" গ্রিয়ারসন মোল্লাকে ডাকিতে আদেশ করিলেন।

শরৎকাল। আশ্বিন মাস। পঞ্জাবের সীমান্তে বেশ একটু শীত

---

* হে দয়াল আমার অবস্থা দেখিয়া দয়া কর, আমি আশার ফাঁদে বন্দী হইয়াছি। আমার আবেদন শুনিবার লোক তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই, দোষ ক্ষমা করিবার তুমিই একমাত্র কর্ত্তা। সাবধান দৃষ্টিতে আমাকে দোষের পথ হইতে দূরে রাখ, আমাকে দোষ-মুক্ত কর, আমার মঙ্গল কর (আমার দোষ উপেক্ষা করিয়া আমার গুণে দৃষ্টি রাখ)।

পড়িয়াছে। প্রাতঃসূর্য্যের হরিদ্রাভ কিরণ শিশিরসিক্ত দুর্ব্বাদলে পড়িয়া চক্‌চক করিতেছে। শীতল বায়ুপ্রবাহে শিশিরবিন্দুগুলি মুক্তাবলীর মতো ঝর ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। গ্রিয়ারসন সাহেবের 'কুঠীর' বড় 'হল'টির মেঝেতে রৌদ্র গড়াগড়ি দিয়া হাসিয়া লুটাইতেছে; সাহেব ও করিমার শুভ্র রেশমী পরিচ্ছদ উজ্জ্বলতর হইয়া চক্ষে ঝিলিক হানিতেছে; রেশমের লাবণ্য ঠিকরিয়া পড়িতেছে। রমজান মোল্লার বেশে আসিয়া সাহেব ও করিমাকে সেলাম করিল। উভয়ে সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। গ্রিয়ারসনের এ কার্য্যটা এই প্রথম।

গৃহের সমগ্র কলেবর ঢাকিয়া 'ম্যাটিং' বা 'ফরাস', তদুপরি 'মসনদ'। রমজান গ্রিয়ারসন দ্বারা আদিষ্ট হইয়া তাহাতে উপবেশন করিল। সাহেব ও করিমা চেয়ার অধিকার করিলেন।

রমজান প্রথমে নমাজ পড়িল, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। সাহেব ও করিমা নতজানু হইয়া তাহাতে যোগ দিলেন। সাহেবও ইংরাজিতে একটু সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিলেন। রমজান গ্রিয়ারসন ও করিমার হস্ত একত্র করিয়া তাহার বন্ধু ইসাকের নিকট হইতে শিক্ষিত একটি কবিতা তিনবার আবৃত্তি করাইল।

"মন্ তু শুদম্, তু মন্ শুদি; মন্ তন্ শুদম্, তু জাঁ শুদি।
তা কস্ ন গোয়েদ্ বাদ্ আজি, মন্ দিগরম্, তু দিগরী॥"

কবি আমির খসরুর এই প্রেমগাথাটি বড় সময়োপযোগী হইয়াছিল। কোন ভট্টাচার্য্য এই বিবাহের পৌরোহিত্য করিলে তিনিও বলাইতেন—"যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।" বুদ্ধিমতী করিমা তাহার তীক্ষ্ণ মেধাবলে তিনবার মাত্র আবৃত্তি করিয়াই উক্ত শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল, এবং জীবনে কখনো তাহা বিস্মৃত হয় নাই।

ইহার পর রমজান নিজের সাদি ও নিকাকালে যে-সকল ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, যতদূর স্মরণ করিতে পারিল সে-সকলের

পুনরভিনয় করিল। বিবাহ হইয়া গেল। মোল্লাবেশী রমজান চলিয়া গেল। ভৃত্যগণ বৈবাহিক পান ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। গৃহে গ্রিয়ারসন ও করিমা ভিন্ন অন্য কেহ রহিল না।

করিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'বিবাহের মন্ত্রার্থ কি সব পালন করিতে হয় ?'

গ্রিয়ার। হয় বৈ কি !

করিমা তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গ্রিয়ারসনের মুখে স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'যদি না করে ?'

গ্রিয়ার। ঈশ্বরের নিকট শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে অনন্ত নরক।

করিমা আর কিছু কহিল না ; একটু অন্যমনা হইয়া বলিল—

"মন্ তু শুদম্, তু মন্ শুদি ; মন্ তন্ শুদম্, তু জাঁ শুদি।
তা কস্ ন গোয়েদ্ বাদ্ আজিঁ, মন্ দিগরম্, তু দিগরী॥

"আমি তুমি হইলাম, তুমি আমি হইলে ; আমি দেহ হইলাম, তুমি প্রাণ হইলে ; ইহার পর কেহ যেন না বলে আমি ভিন্ন, তুমি ভিন্ন। ইহার ভাব কি সুন্দর !"

গ্রিয়ারসন করিমাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন, আজ সে বাধা দিল না। গ্রিয়ারসন হাসিয়া বলিলেন, "আয়্ চিড়িয়া, ফাঁদে পড়িলি ; কই পলাইলি না ?" করিমা গ্রিয়ারসনের স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটি স্থাপন করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—"মন্ তু শুদম্, আমি তোমার হইয়াছি, আর যাইব কোথায় ? কিন্তু দেখিও প্রভু, তা কস্ ন গোয়েদ বাদ্ আজিঁ মন্ দিগরম্, তু দিগরী।"

গ্রিয়ারসন দুই হাতে তাহার নিটোল সুন্দর মুখখানি ধরিয়া তাহার ওষ্ঠে ললাটে উপর্য্যুপরি চুম্বন বর্ষণ করিয়া কহিলেন, "তু জাঁ শুদি, তুমি আমার জান, তবে আর ভয় কি পিয়ারে ?"

অষ্টমী

পিতৃমাতৃহীনা অনাথা করিমা আজ কর্ণেল গ্রিয়ারসনের পত্নী, মিসেস করিমা গ্রিয়ারসন। যে অপরিষ্কার ওয়াজিরি-কন্যা অসভ্য অবস্থায় উষ্ট্রের শুষ্ক বিষ্ঠায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অর্দ্ধদগ্ধ মেষমাংস ভক্ষণে উদর পূর্ত্তি করিয়াছে, সে আজ অশন বসনের বিলাসিতায় পরিবেষ্টিত। সে স্ত্রীলোকের সহজাত তীক্ষ্ণতায় সভ্য সাহেবের যোগ্য হইয়াছে।

রত্নাভরণভূষিতা হইয়াও দরিদ্রা ওয়াজিরি-কন্যার মুখ ম্লান, প্রাণ অশান্ত। তাহার সর্ব্বদাই মনে হয়, যেন কি অমূল্য নিধি হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে কি যেন পাইয়াছে, তাহাও যেন হারাইবে হারাইবে বলিয়া ভয় হইতেছে। অসীমরহস্যময়ী করিমা তাহার মনের এই চঞ্চলতা গ্রিয়ারসনকে কিছুই জানিতে দেয় নাই। তাঁহার নিকট সে সর্ব্বদাই ফুল্লমুখী, সোহাগিনী।

বিবাহের পর আট দশ মাস কাটিয়া গিয়াছে; বর্ষা কাল। কয়েকদিন হইতে অবিরল বৃষ্টি হইতেছে। গ্রিয়ারসন একটি দূরবর্ত্তী সেনানিবাস পরিদর্শনে গিয়াছেন; দুই দিনের মধ্যে ফিরিবার কথা ছিল, বৃষ্টির জন্য ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে। একে অবিরল বৃষ্টি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহার উপর গ্রিয়ারসনের অনুপস্থিতি; করিমার স্বাভাবিক অশান্তি উগ্রতর হইয়া উঠিয়াছে। সে নিরবলম্বন অবস্থায় গ্রিয়ারসনের এ বই ও বই দেখিতে দেখিতে একটা খাতায় দেখিল, পারস্য অক্ষরে একটি কবিতা ও তন্নিম্নে তাহার ইংরাজি অনুবাদ লিখিত রহিয়াছে—

"কুনদ্ হম্ জেন্‌স্ বা হম্ জেন্‌স্ পর্‌ওয়াজ।
কবুতর্ বা কবুতর্ বাজ্ বা বাজ্।"

"The same with same shall wing its flight,
The dove with dove, the kite with kite."

ইহা পাঠ করিয়া করিমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; তাহার মাথার ভিতর কিসের একটা 'সোরগোল' পড়িয়া গেল, প্রাণের মধ্যে দ্রবাগ্নিপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। তাহার অবসন্ন হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া খাতা ভূমিতে পড়িয়া গেল; সে দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া, টেবিলের উপর বুক চাপিয়া লতাইয়া পড়িল। করিমা কাঁদিল। বহুক্ষণ কাঁদিয়া প্রাণের অগ্নি অনেকটা নির্ব্বাপিত করিল। হৃদয়ের গুরু বেদনার লাঘব করিয়া সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল, "আমি ছার ওয়াজিরি, তুমি প্রভু জগৎপূজ্য ইংরাজ; উভয়ের মিলন কি একেবারেই অসম্ভব? তুমি ত' আমায় ভালোবাস, আমিও যে তোমায় বড় ভালো বাসি, তবু এ পোড়া নারীহৃদয়ে এত ভয় কেন? আমার যে ভয়, তোমার প্রাণেও কি তাহা পৌঁছিয়াছে? আমাদের মিলন কি স্থায়ী হইবে না? একত্র গ্রথিত প্রাণ কি কখনো বিযুক্ত হইয়া যাইবে?" করিমা আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া পাদোপান্তে পতিত খাতাখানি কুড়াইয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত কবিতা ও অনুবাদ আর একবার পাঠ করিল, পরে লেখনী লইয়া তাহার নিম্নে লিখিল—

"মন্ তু শুদম্ তু মন্ শুদি; মন্ তন্ শুদম্ তু জা শুদি।
তা কস্ ন গোয়েদ্ বাদ্ আঁজি, মন্ দিগরম্ তু দিগরী।
Henceforth you and I two halv's make a whole;
I the gross body, you the finer soul.
Take care lest any one should come and say,
We are but sever'd, on some future day."

করিমা খাতাখানি যথাস্থানে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল গ্রিয়ারসন প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; সম্পূর্ণ সিক্ত, তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। করিমা একটি উদ্বেল তরঙ্গের মতো ঝাঁপাইয়া সেই

প্রশস্ত বক্ষতটে যাইয়া পড়িল, তাহাকে তরঙ্গের মতো প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল না। গ্রিয়ারসন তাহাকে বেষ্টন করিয়া প্রগাঢ় চুম্বন বর্ষণ করিলেন। তৎপরে সস্নেহে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"করিমা ববথশয় বরহালেমা, তুমি কাঁদিয়াছ?" করিমা একটু হাসিয়া বলিল "কেমন করিয়া বুঝিলে?"

গ্রিয়ার। চোখের পাতা ভিজা রহিয়াছে, চোথ ফুলিয়াছে।

করিমা। হাঁ কাঁদিয়াছি।

গ্রিয়ার। কেন ডার্লিং?

করিমা মৃদু হাস্তে কহিল 'তোমার বিরহে।' গ্রিয়ারসনও সহাস্ত চুম্বনে করিমাকে সোহাগ জানাইয়া কহিলেন, "আমিও ইহাই ভাবিয়া বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া সারাপথ ভিজিয়া তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" করিমা স্বামীর স্নেহাতিশয্য দেখিয়া বিহ্বল হইয়া কিছু কহিতে পারিল না; কেবল একটি সঙ্কোচভরা ক্ষুদ্র চুম্বন স্বামীকে উপহার দিল। সে মনে মনে বলিল, "প্রভু আমাকে এত ভালো বাসেন; তবু আমি তাঁহাকে সন্দেহ করি? ধিক!"

করিমাকে বিবাহ করা অবধি গ্রিয়ারসন তাহার প্রেমে এমনি মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁহার বার বার কর্ত্তব্যের ক্রটি হইতে লাগিল। তিনি করিমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না, যাইলেও অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না। এইরূপে করিমা-স্নেহ-কাতর গ্রিয়ারসন বহু ক্রটি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা তাঁহার ওয়াজিরি-কন্যার বিবাহবৃত্তান্ত অবগত হইয়াও নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। এইসকল কারণ পরম্পরায় গ্রিয়ারসন সীমান্ত হইতে পঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশে বদলি হইয়া গেলেন।

বদলি হইয়াও গ্রিয়ারসন নির্য্যাতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি-লেন না। সীমান্তে তিনি একাকী ছিলেন, এখানে সাহেব-সমাজের

মধ্যে গিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ওয়াজিরি-কন্যার সহিত দেখিয়া এই নূতন সেনানিবাসের যত মহিলাগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উঠিলেন; তাঁহাদের স্বাভাবিক বমনস্পৃহা ওয়াজিরি-কন্যার সংসর্গে অদম্য ও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহারা স্ব স্ব অধীনস্থ পুরুষদিগকে 'নাছোড়' হইয়া ধরিয়া বসিলেন, গ্রিয়ারসনকে 'এক ঘরে' করিতে হইবে। করুণহৃদয়া কামিনী-গণের উদ্দেশ্য, গ্রিয়ারসন ওয়াজিরি-কন্যা বিবাহের ফলস্বরূপ সহানুভূতি-হীন দুর্ব্বহ জীবন বহন করুন। গ্রিয়ারসন এইরূপে উত্যক্ত হইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত, বড়ই ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন; য়ুরোপীয়গণ তাঁহার জীবনটাকে ভারাক্রান্ত করিয়া দুর্ব্বহ করিবার যতই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, গ্রিয়ার-সনও ততই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িতে লাগিলেন। করিমাকে বিবাহ করা জীবনের মহাভ্রম মনে হইতে লাগিল। কিন্তু যখন করিমার শিশুবৎ সরল মুখখানি দেখিতেন, তখন আর তাঁহার কিছু মনে থাকিত না; তিনি নিগ্রহ সহ্য করিতে মন স্থির করিতেন। প্রখরবুদ্ধিশালিনী করিমা স্বামীর মনোভাব পাঠ করিতে পারিত; সে স্বামীর এইরূপ দোলায়মান চিত্তকে ভাবী বিপদের সূচনা বলিয়া ভীত হইয়া পড়িতে লাগিল; আবার তাহার জন্য তাহার স্বামীর এতাদৃশ নিগ্রহ দেখিয়া অকৃত্রিম ভক্তিভরে নিরাশ্রয়া লতিকার মতো তাঁহার প্রতি অধিক নির্ভর করিতে লাগিল; তাহার প্রেম লতিকার মতো শতবাহুবন্ধনে তাহার স্বামীর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের আশ্রয় দৃঢ়তর করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। করিমা জানিত, গ্রিয়ার-সন তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহার আর গত্যন্তর নাই, দাঁড়াইবার স্থান নাই। জন্মদুঃখিনী অনাথা করিমার শুষ্ক হাস্য আরো শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল; অজস্র চিন্তায় করিমার রূপে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইল; তাহার দেহ ছাপাইয়া যে লাবণ্য সদ্যনির্গলিত মদিরার মতো উচ্ছসিত হইয়া পড়িত, তাহার তীব্রতার বেগ হ্রস্ব হইয়া পড়িতে লাগিল; তাহার উন্নিদ্র যৌবন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। করিমা পীড়িতা হইল।

দেহের সৌকুমার্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইল; করিমা ক্ষীণ বিশ্রী হইয়া পড়িল। কোনো য়ুরোপীয় চিকিৎসক তাহার চিকিৎসার ভার লইল না। করিমা সন্তুষ্ট হইল; মৃত্যু ত তাহার বাঞ্ছিত; মৃত্যুর পথ সুগম হইতেছে দেখিয়া সে সন্তুষ্ট হইল। গ্রিয়ারসন কর্ণেল হইয়া দেশীয় চিকিৎসককে চিকিৎসার ভার দেওয়া হীনতা বলিয়া মনে করিলেন; তাঁহারও মনের কোনো এক নিভৃত কোণে করিমার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছনীয় বলিয়া এক একবার বোধ হইতেছিল; তাই তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমুখ করিতেছিল।

গ্রিয়ারসনের প্রতিবেশী একজন পাদরি। পতিতকে উদ্ধার করা, পরহিতে জীবনোৎসর্গ করা যাঁহাদিগের ধর্ম্ম, তাঁহাদেরই একজন এই পাদরি চ্যাটারটন। গ্রিয়ারসনকে সকল শ্বেতকায় পরিত্যাগ করিলেও তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। চ্যাটারটন বিপত্নীক; একমাত্র কন্যা মিলিই তাঁহার সংসার-বন্ধন। গ্রিয়ারসনের বর্ত্তমান বিপদে তাঁহারা পিতাপুত্রীই তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যদাতা। এই কারণে চ্যাটারটন-পিতাপুত্রীর সহিত কৃতজ্ঞতাসূত্রে গ্রিয়ারসন সখ্যতা সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। করিমা পীড়িত হওয়ার পর পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য গ্রিয়ারসনকে প্রায় চ্যাটারটন-গৃহে যাইতে হইত। বৃদ্ধ চ্যাটারটন অধিকাংশ সময়েই স্বীয় কার্য্যানুরোধে গৃহে অনুপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু মিলি তাঁহার সাহায্য করিতে ক্রটি করিত না।

মিলির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ারসনের আসঙ্গলিপ্সাও প্রবল হইয়া উঠিল। করিমার সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই; উজ্জ্বল ভাসমান চক্ষু কোটরগত হইয়া তাহার তীব্র মাদকতা হারাইয়াছে; নিটোল কপোল বসিয়া গিয়াছে। এইসকলের তুলনায় যুবতী মিলি গ্রিয়ারসনের চক্ষে অপূর্ব্ব সুন্দরীরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; গ্রিয়ারসন মিলিকে ভালো বাসিলেন, মিলিও গ্রিয়ারসনে আসক্ত হইল। করিমার কপাল ভাঙ্গিবার সূত্রপাত হইল।

করিমার পীড়ার প্রথমাবস্থায় মিলি গ্রিয়ারসনের বামহস্তে আপনার সুডোল দক্ষিণ বাহুখানি জড়াইয়া, গ্রিয়ারসনের উপর আপনার দেহভার এলাইয়া দিয়া করিমাকে দেখিতে আসিত। করিমার প্রাচ্যরমণীসুলভ একনিষ্ঠ প্রাণ এত ঘনিষ্ঠতা ভালোবাসিত না; অথচ কিছু বলিতেও পারিত না, অথবা সে স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলিতে জানিত না। যখন তাহার কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন সে নীরবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দুই চারি বিন্দু পতনোন্মুখ কম্পমান অশ্রু মোচন করিত। মিলি তাহাকে কথা কহাইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইত না। কষ্টসহিষ্ণু গুপ্তভাবা করিমা মিলির প্রতি তাহার বিদ্বেষ ঘৃণা গোপন রাখিতে পারিত না। স্ত্রীলোক বুঝি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারে, কেবল স্বামীর সোহাগের ভাগ দিতে পারে না।

মিলি যখন দেখিল, করিমা আর সকলের সঙ্গে কথা কহে, প্রশ্নের উত্তর দেয়, কেবল তাহারই নিকট সে নির্ব্বাক, তখন সে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রিয়ারসনের গৃহে আসা বন্ধ করিল। উপকর্ত্রী মিলিকে অবজ্ঞা করায় গ্রিয়ারসন করিমার প্রতি ছোট খাটো একটি ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিলেন; করিমা নীরবে সমস্ত শুনিল; স্বামীকে কিছুই বলিল না। গ্রিয়ারসন আরো বিরক্ত হইলেন।

মিলি গ্রিয়ারসনের বাটীতে আসা বন্ধ করিল, কিন্তু গ্রিয়ারসন তাহার সন্নিকর্ষ ত্যাগ অসম্ভব মনে করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি মিলিকে পার্শ্বে লইয়া করিমার নিকট বসিয়া থাকিতেন; এক্ষণে মিলি তাঁহার গৃহে আসিতে অস্বীকার করায়, তিনি সারাদিনই মিলির ভবনে যাপন করিতে লাগিলেন; কেবল স্নান ভোজনের সময় গৃহে আসিয়া একবার করিমার সন্ধান লইতেন। যেদিন ভোজন-কার্য্যটা মিলির গৃহে হইত, সেদিন আর করিমার ভাগ্যে স্বামী সন্দর্শন ঘটিয়া উঠিত না। করিমা বুঝিল তাহার কপাল ভাঙিয়াছে। তখন তাহার স্মরণ হইল—

"কুনদ্ হম্ জেন্‌স্ বা হম্ জেন্‌স্ পরিওয়াজ।
কবুতর্ বা কবুতর, বাজ বা বাজ॥"

The same with same shall wing its flight,—
The dove with dove, the kite with kite.

করিমা সাগ্রহে মৃত্যুকে আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু মৃত্যুকে যে চাহে, মৃত্যু তাহাকে চাহে না। হতভাগিনী ক্রমশ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। করিমা ভাবিল, "কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা ভোগের জন্য বাঁচিয়া উঠিতেছি!"

ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ারসন ও মিলির ব্যবহার প্রণয়-পরিচায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। ইংলণ্ডীয় মহিলার বিলাসকলায় বিমুগ্ধ গ্রিয়ারসন বন্যা সরলা স্ত্রীর প্রতি একেবারেই বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। বিদেশীয় স্ত্রী-সহবাসের যে নূতনত্বহেতু মনোহারিত্ব, তাহা তাঁহার পূর্ণরূপে অধিগত হওয়ায় এক্ষণে অপগত হইয়াছিল; এবং স্বদেশীয় মহিলার বিচিত্র ভাব-চাতুর্য্যে তিনি একান্ত বন্দী হইয়া পড়িলেন। রমণী-সঙ্গ-বর্জ্জিত গ্রিয়ার-সনের নিকট রমণী-সঙ্গ বড়ই উন্মাদক; এইজন্যও তাঁহার চিত্ত একজনকে আশ্রয় না করিয়া নূতনত্বের উপাসক হইয়া পড়িয়াছিল। অধিকন্তু করিমা গ্রিয়ারসনের নিকট যে-সব রীতি নীতি, আদব কায়দা শিখিয়াছিল, তাহাই তাহার সম্বল; পুরুষের শিক্ষিত স্ত্রীলোক কখনো ঠিক সঙ্গত হইতে পারে না; জন্মাবচ্ছিন্ন শিক্ষিতা মিলি বিলাসকলায় তাহা অপেক্ষা বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। একজন বিজনপ্রদেশবাসিনী প্রকৃতি-শিক্ষিতা কপাল-কুণ্ডলা, অন্যজন বহুজনসেবিতা বিবিধবিভ্রমশালিনী মতিবিবির সহিত তুলিত হইতে পারে; একজন তপোবনবর্দ্ধিতা বনকুরঙ্গীতুল্যা সরলা শকুন্তলা, অন্যজন ইন্দ্রসভার প্রধানা নায়িকা উর্ব্বশী। নরধর্ম্মী গ্রিয়ারসন অভাবের সময় দেবধর্ম্মী করিমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকিলেও এক্ষণে আর তাহাকে তাঁহার ভালো লাগিতে পারে না; ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই জন্য তাহার সরলতামাখা ম্লানবদন গ্রিয়ারসনের নিকট বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া

বোধ হইতে লাগিল। মিলির চটুল চাহনিতে ভুলিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। অমূল্য রত্ন অগ্রাহ্য করিয়া কাচের জন্য উন্মত্ত হইলেন।

গ্রিয়ারসন ও মিলির মনোভাব বুঝিতে বৃদ্ধ চ্যাটারটনের বাকি রহিল না। বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া গ্রিয়ারসনকে কহিলেন, "দেখ, অভাবের সময় আমরা যথাসাধ্য তোমাদের সাহায্য করিয়াছি; এক্ষণে সে বিপদ অপগত হইয়াছে। তোমার আর মিলির সাহায্যের কোনো আবশ্যক নাই; মিলিরও তোমার নিকট কোনো আবশ্যক নাই। যদি কখনো কোনো আবশ্যক হয়, আমাকে বলিলেই চলিতে পারিবে। দেখ, তুমি আর কখনো মিলির সহিত আমার অসাক্ষাতে সাক্ষাৎ করিবে না।" তৎপরে মিলির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "এস মিলি, আমার এই শুভ্রকেশ স্পর্শ করিয়া শপথ কর, আর কখনও গ্রিয়ারসনের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। এস, প্রতিজ্ঞা কর।" মিলি নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল; গ্রিয়ারসন বিনীতভাবে বহু ভূমিকার পর বলিলেন, "আমি মিলিকে ভালো বাসিয়াছি, মিলিও আমায় ভালো বাসে; তাহার সম্পূর্ণ মত আছে। এক্ষণে আপনার মত পাইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারি।"

চ্যাটারটন বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? করিমা?"

গ্রিয়ারসন বৃদ্ধের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, "করিমা আমার ধর্ম্মানুমোদিতা স্ত্রী নহে; সে মুসলমানী, আমি খৃষ্টান; আমরা উভয়ে রীতিমত বিবাহিত নহি। বিবাহের একটা ভাণ করা হইয়াছিল, তাহাও মসলেম ধর্ম্মমতে; আমার একটা সহিস গোটাকতক পারস্য কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিয়াছিল মাত্র।"

এই কথা বলিবামাত্র গ্রিয়ারসনের বুকের মধ্যে একটা আঘাত লাগিল; তাঁহার বিবাহকালের প্রতিজ্ঞা মনে হইল—

"মন্ তু শুদম্, তু মন্ শুদি: মন্ তন্ শুদম্, তু জাঁ শুদি।
তা কস্ ন গোয়েদ্ বাদ্ আজি, মন্ দিগরম্, তু দিগরী॥"

গ্রিয়ারসন একবার ঢোক গিলিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিলেন, তৎপরে মিলির সুন্দর নিটোল বদনশ্রী দেখিলেন; তাহার রূপ-মোহ তাঁহার ধর্ম্মভাবজনিত দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিল; তিনি বল সংগ্রহ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মিলিও প্রথমে বিবাহে স্বীকৃতা হয় নাই; কিন্তু আমি তাহাকে করিমার সহিত আমার মিথ্যা বিবাহের প্রমাণ দেখাইয়া মত করিয়াছি। আর যদিই বিবাহ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মমতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হইতে পারে। এক্ষণে আশা করি আপনার অনুমতি পাইব।" বৃদ্ধের নিকট গ্রিয়ারসনের প্রতিজ্ঞা অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তার পর কহিলেন, "করিমার কি উপায় করিবে?"

গ্রিয়ার। তাহাও আমি স্থির করিয়াছি। তাহাকে যথেষ্ট অর্থালঙ্কার দিয়া, তাহার পূর্ব্বতন ওয়াজিরি প্রভুর আশ্রয়ে রাখিয়া আসিব। আমি অনেক অনুসন্ধানে সেই ওয়াজিরি সর্দ্দারকে বাহির করিয়া, তাহাকে রাজি করিয়াছি।

চ্যাটার। করিমা রাজি হইবে?

গ্রিয়ার। হইবে; সে যাইতে নিজেই ইচ্ছুক; বন্য কি কখনো পোষ মানে? আমি দুই এক দিনের মধ্যেই রাখিতে যাইব।

গ্রিয়ারসন স্বার্থের জন্য, রূপের জন্য কর্ত্তব্য ভুলিয়া মিথ্যা কহিলেন। বৃদ্ধ সরল চ্যাটারটনও প্রতারিত হইয়া অধর্ম্মের সহায়তা করিলেন। চ্যাটারটন কহিলেন, "তুমি তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেই বিবাহ হইবে।"

গ্রিয়ারসন আনন্দাবেগে বৃদ্ধ চ্যাটারটনের হস্ত চুম্বন করিলেন ; বৃদ্ধ করমর্দ্দন করিয়া গ্রিয়ারসন ও মিলিকে বিদায় দিলেন। মিলির প্রাণ আনন্দ-উচ্ছ্বল ; কিন্তু গ্রিয়ারসনের প্রাণের কোন্ নিভৃত অন্তরালে একটু বেদনা পদবিদ্ধকণ্টকের বেদনার মতো জমিয়াছিল, তাহা তিনি ঠিক ধরিতে পারিতেছিলেন না। মিলি চ্যাটারটন গ্রিয়ারসনকে সান্ধ্য ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল। করিমার আজ আর স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়া উঠিল না।

নবমী

আজ বহুদিন পরে করিমার ভাগ্যে স্বামিসন্দর্শন ঘটিয়াছে। সে স্বামীর হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। গ্রিয়ারসন করিমাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রাতে আমাকে সীমান্ত প্রদেশে যাইতে হইবে ; তুমি আমার সহিত যাইবে কি ?" করিমা যেন হাতে স্বর্গ পাইল ; তৎক্ষণাৎ সে যাইতে স্বীকৃত হইল। প্রাচ্য রমণীর স্বভাব স্বামীর ইচ্ছানুবর্ত্তী ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইতে পারে না। আরো হতভাগিনী ভাবিল, মিলির সঙ্গছাড়া হইয়া তাহার সাহচর্য্যে গ্রিয়ারসনের পূর্ব্ব স্নেহ উজ্জীবিত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও কৃতসঙ্কল্প গ্রিয়ারসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ভেদ করিতে পারে নাই। ব্যাধের বংশীরবমুগ্ধা কুরঙ্গিনী আপনা হইতে জালে গিয়া পড়িল।

গ্রিয়ারসন করিমার সহিত সীমান্ত প্রদেশের জিলাখেলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জিলাখেলের ওয়াজিরিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কর্ণেল সাহেবের অভয়বাণীতে তাহারা আশ্বস্ত হইল। গ্রিয়ারসন শিবিরে দুই চারি দিবস থাকিয়া তাঁহার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া করিমাকে পার্শ্বে লইয়া বসিয়া আছেন ; করিমার সহজোৎফুল্ল কৃষ্ণতার চক্ষুর্দ্বয় সাহেবের

ঈষৎ চিন্তাকুল কুঞ্চিত ললাটে ও বদনে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। গ্রিয়ারসন ক্ষণেক পরে করিমাকে কহিলেন, "বেড়াইতে যাইবে?" করিমা সহজেই স্বীকৃত হইল। তৎপরে গ্রিয়ারসন বলিলেন, "করিমা, আজ হইতে দুই বৎসর পূর্ব্বে এমনি উজ্জ্বল অপরাহ্নে আমি তোমায় যে উপলরাশির মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম, চল সেই থানে তেমনি করিয়া একই অশ্বে আরোহণ করিয়া বেড়াইতে যাইব।" করিমার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত আসন্ন বিপদের ভয়ে অভিভূত হইয়া উঠিল; কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া একটু ইতস্তত করিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

দুই বৎসর পরে করিমা সেই গিরিনদী-সৈকতে উপলরাশির মধ্যে আসীনা; সে দিনের সঙ্গে তাহার অবস্থার কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে; সে এক্ষণে সেই অসভ্য ওয়াজিরি-কন্যা নহে, সুসভ্য ইংরেজ-গৃহিণী ও স্বামীর পার্শ্বে আসীনা। গিরি-নদীর কলনাদে ক্ষুদ্র অরণ্যানী তেমনি প্রশান্ত নিদ্রায় নীরব, ফুল তেমনি বিহাস-বিকশিত। করিমা স্বামীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বসিয়া আছে। গ্রিয়ারসন পকেট হইতে একটা জড়ানো কাগজ বাহির করিলেন; করিমা তাহা দেখিবার জন্য মস্তক তুলিল; গ্রিয়ারসন কাগজখানা তাহার হাতে দিলেন। পড়িতে পড়িতে করিমার দীর্ঘায়ত ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, চক্ষু বিস্ফারিত ও দীপ্যমান হইয়া উঠিল। কাগজখানি করিমার সহিত গ্রিয়ারসনের বিবাহবিচ্ছেদ-লিপি বা 'তালাক' পত্র। করিমা গ্রিয়ারসনের পূর্ব্বাপর কপট ব্যবহার অবগত হইয়া নিদারুণ আঘাত পাইল। এক ফোঁটা অশ্রু মোচন করিল না, একটি কথা কহিল না। তাহার দুঃখের বুঝি বাহ্য বিকাশ অসম্ভব। তাহার দুঃখ বুঝি প্রকাশের অতীত। গ্রিয়ারসন একটা শব্দ করিলেন; তাহাতে বনমধ্য হইতে একটা সিপাহি একটা বৃহৎ ব্যাগ ও মায় সরঞ্জাম দুইটা বন্দুক লইয়া উপস্থিত হইল; এবং অপর দিক হইতে জিলাখেল ওয়াজিরিদিগের একজন প্রধান সর্দ্দার আসিয়া

দণ্ডায়মান হইল। করিমা তাহার পূর্ব্বপরিচিত সেই সর্দ্দারকে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সর্দ্দার একবার চোখ মটকাইয়া একটু হাসিল।

গ্রিয়ারসন তখন করিমাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "দেখ করিমা, তোমাদের পারস্য কবিই বলিয়াছেন, সমজাতীয় না হইলে কাহারও পূর্ণমিলন হইতে পারে না; আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য্য ও উচিত। তোমাকে এই ব্যাগটি দিলাম; ইহাতে যে-সব রত্নালঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি আছে তাহা বহুমূল্য; এই সর্দ্দার বা অন্য কোনো স্বজাতীয় পুরুষকে বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারিবে। সর্দ্দারও তোমায় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সাজ সরঞ্জাম এই বন্দুক দুটি তাঁহাকে আমি দিতে ইচ্ছা করি।"

গ্রিয়ারসনের বাক্যসমাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই সর্দ্দার আগ্রহে বন্দুক দুইটি আকর্ষণ করিল; ইহা অপেক্ষা আদরের জিনিষ আর বুঝি জগতে কিছু নাই। সিপাহি বনান্তরালে অন্তর্হিত হইল; গ্রিয়ারসন ঘোড়ায় উঠিলেন। করিমা জড়ের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সে যেন ভালো করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছে না; মানুষের এরূপ বিপদ হইতে পারে, সে যেন বিশ্বাস করিতে চাহে না। তাহার চক্ষু জলবিন্দুশূন্য, জ্বালাময়; বদনমণ্ডল পাণ্ডুর; দেহ অস্পন্দ।

করিমার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া গ্রিয়ারসনের একটু কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি যে কোনোরূপ অমানুষিক বা নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। তিনি তাহাকে নিরাশ্রয়া ও দরিদ্রা পাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাকে শিক্ষিতা, সভ্যা ও ধনশালিনী করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন। ইহাতে অসুখের কারণ তিনি বিন্দুমাত্রও খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার নিজের ভাষাতেই একটা প্রবচন প্রচলিত আছে যে—

'Ignorance is bliss and knowledge is damned'.

গ্রিয়ারসনের অশ্বের মুখ ফিরিল। যে পরিত্যক্তা নিরাশ্রয়া রমণীকে দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বালুকাপ্রস্তররাশি হইতে কুড়াইয়া লইয়াছিলেন, তাহাকে সেই নদীসৈকতে উপলরাশির মধ্যে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দুইটা মিষ্ট কথা কহিলেন না, শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন না; ইহা করিমাকে স্বামীর পূর্ব্বাপর কপট ব্যবহার অপেক্ষা অধিক বেদনা দিতে পারে নাই।

ওয়াজিরিদিগের নিকট স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পুরুষের সাহসই প্রধান বা একমাত্র রক্ষণীয় ধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য। তাহাদের সমাজে অসতী বা ভীরুর স্থান নাই। ভীরু ও অসতীর কাহিনী ওয়াজিরিদিগের "সরমের কথা"।

করিমা একনিষ্ঠ ও একপতি হইয়াও বিজাতীয় সংসর্গে অসতী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সর্দ্দারগণ সকলকে বুঝাইয়া রাখিয়াছিল যে তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে গ্রিয়ারসনপ্রমুখ ইংরাজসেনানীগণ তাহাদিগের প্রতি করুণ ব্যবহার করিবে। অধিকন্তু গ্রিয়ারসনপ্রদত্ত অর্থালঙ্কাররাশিও করিমার সমাদর লাভের কারণ হইয়াছিল। অনেকে করিমাকে বিবাহ করিতেও উৎসুক ছিল। দরিদ্র বর্ব্বরের নিকট অর্থ বড় লোভনীয়।

করিমাকে সর্দ্দার তাহাদের আড্ডায় লইয়া আসিবামাত্র করিমার সমবয়স্কা পূর্ব্বপরিচিতা কতকগুলি স্ত্রীলোক সাগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিল; সকলেই তাহাকে আনন্দ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। এতক্ষণে করিমার সংজ্ঞা ও চৈতন্য হইল। মূর্চ্ছাকালে 'এমোনিয়ার' উগ্রগন্ধ যেরূপ চৈতন্য সম্পাদনে সহায়তা করে, ওয়াজিরি-কন্যাগণের অপরিচ্ছন্ন-গাত্র-সংস্পর্শও সেইরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল। ইংরাজসহবাসে করিমা নূতন স্বভাব পাইয়াছে, সে অভ্যর্থনাকারিণী রমণীগণকে বর্ব্বর মনে করিয়া উদ্যতফণসর্পদর্শী পথিকের ন্যায় সশঙ্কে পশ্চাৎপদ হইল। ওয়াজিরিগণ ইহাও সহ্য করিল।

স্বতন্ত্রভাবে করিমা দুইচারি দিন ওয়াজিরি-আড্ডায় কাটাইয়া দিল। সে স্ত্রীলোকদিগকে উপহাস করে, পুরুষগণকে ঘৃণা করে, তাহাদের বিবাহ-প্রস্তাব অপমানজনক বোধ করে, গৃহকর্ম্মাদি করিতে কুণ্ঠিত হয়। ওয়াজিরি-কন্যার সতীত্বগর্ব্ব ও ইংরাজ মহিলার সভ্যতাভিমানের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে করিমার চরিত্র যেরূপ বিচিত্রভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে ওয়াজিরি পুরুষকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ সকলে তাহার প্রতি জাতবৈর হইয়া উহাকে বিচারের জন্য মোল্লার নিকট উপস্থিত করিল। মোল্লাই তাহাদের প্রধান নেতা; ধর্ম্মান্ধ ওয়াজিরিগণ মোল্লাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া মনে করিত। মোল্লা যখন করিমাকে ইংরাজের 'গুপ্তচর ও কাফের' বলিয়া ঘোষণা করিল, সকলে তাহা অকাট্য ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া করিমার অদৃষ্টলিপিতে একবাক্যে মৃত্যুদণ্ড লিখিয়া তাহাকে নামশেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

এই সময়ে তাহাদের গুপ্তচর সংবাদ লইয়া আসিল, গ্রিয়ারসন মিলিকে বিবাহ করিয়াছেন। করিমা তখন সকলের চক্ষে উগ্রতররূপে কুলটা, স্বধর্ম্মচ্যুতা উচ্ছৃঙ্খল রমণী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সে গর্ব্বিতা ধনশালিনী, ইহাও তাহাদের লজ্জা ও কলঙ্কের কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। করিমার অদৃষ্ট স্থিরতর হইল। এবং এই সঙ্গে ওয়াজিরিগণের প্রতিহিংসা গ্রিয়ারসনের উপর জ্বলিয়া উঠিল। তাহাদের জাতীয় স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ করিয়াও অপ্রতিহিংসিত গ্রিয়ারসনের জীবন তাহাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্কলেপ-বৎ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

বিসর্জ্জন।

শীতকাল। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে, পর্ব্বতমালা শুভ্রতুষার-সমাচ্ছন্ন। বৃক্ষসকল পত্রহীন হইয়া নিরাভরণ কাণ্ড ও শাখা লইয়া শীতের রাজত্ব-

গরিমা জ্ঞাপন করিতেছে; তাহাদেরও সর্ব্বাঙ্গে শুভ্রতুষার প্রলিপ্ত হওয়ায় তাহারা স্ফটিকবৃক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

মাঘমাস। আজ যেন আরো শীত ঢালিয়া দিয়াছে। কুজ্ঝটিকার তামস যবনিকা উষার স্নিগ্ধ শান্ত বদনখানি বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছে, সূর্য্য ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিকালে ওয়াজিরিগণ করিমাকে লইয়া এক অধিত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কি এক উদ্দাম বর্ব্বর উল্লাসে ওয়াজিরিহৃদয় উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। করিমা স্নিগ্ধ, শান্ত, অচঞ্চল। তাহার সঙ্গে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না। ওয়াজিরিগণ করিমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার পূত অঙ্গ হইতে কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া লইল; প্রকৃতির নগ্নবেশে করিমা মহামহিমাময়ী শোভা-শালিনী। সে একবার শীতে কাঁপিল; তাহার হৃদয়ে, চক্ষে, প্রতি লোমকূপে যে উগ্র অগ্নি ছুটিতেছিল, তাহা পার্থিব শীতলতাকে উপহাসে বিতাড়িত করিল। করিমা ঈশ্বরধ্যানে অচেতন। চতুর্দ্দিকে দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দস্যুগণ উল্লসিত তাণ্ডবনৃত্যে পদতলের তুষাররাশি চূর্ণ করিয়া জলময় করিতেছিল; করিমার অলোকসামান্য রূপ ও অটুট যৌবনগৌরবে তাহাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না; তাহারা নিজের জয়ে উন্মত্ত। করিমা এখনো বাহ্যজ্ঞানবিরহিত। মোল্লা নৃত্য করিতে করিতে তাহার হস্তস্থিত গুরুভার তরবারি দ্বারা করিমার পঞ্জরে আঘাত করিল, করিমা দীনশরণ "আল্লা"কে স্মরণ করিয়া হস্ত ও জানু ভর করিয়া পতিত হইল। মোল্লা পুনরায় আঘাত করিল, করিমা শোণিতরঞ্জিত হইয়া চন্দনপ্রলিপ্ত পদ্মফুলটির মতো সেই বিশ্বশরণের চরণোপান্তে বিলুণ্ঠিত হইল। উহার কণ্ঠের কি এক অস্ফুট বাণী উন্মাদ চীৎকারের মধ্যে অশ্রুত রহিয়া গেল। যেই করিমা ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, অমনি রাশি রাশি উপলখণ্ড আসিয়া তাহার অনিন্দ্য সুন্দর শুভ্রতনু বিকৃত করিয়া দিল। তাহার জীবন শেষ হইতে না হইতে মৃৎপ্রস্তরতুষাররাশিতে তাহার সমাধি শেষ হইয়া গেল।

করিমারও জীবনের শেষ স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া গেল। করিমার প্রাণভরা একাগ্র প্রেমের এই অবসান!

হত্যাকারিগণ তাহাদের দলে যাইয়া উপস্থিত। সেই দল তখন ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ বক্রপথে তাহাদের আড্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা সকলে হত্যাকারিগণকে দেখিয়া জয়োল্লাসে কোলাহল করিয়া উঠিল। দলের প্রধান সর্দ্দারগণ করিমার সমস্ত সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইল। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না। গ্রিয়ারসন, এমন কি ইংরাজ জাতিকেই উচ্ছেদ করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিহিংসা পূর্ণ হইবে না। নিহত রমণীর শোণিতপাত এবং ওয়াজিরিকুলের 'সরমের' কারণ ত' সেই গ্রিয়ারসনই।

গুপ্তচরগণ গ্রিয়ারসনকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত হইল। তাহারা ব্যবসায়ের অছিলা করিয়া পঞ্জাব প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিল। বহুবৎসর গ্রিয়ারসনের কোনও অনুসন্ধানই পাওয়া গেল না। বহুবৎসর পরে জিলাখেলের দুই ব্যক্তি একটি গমনশীল সিপাহিদলের ছাউনিতে আসিয়া অবগত হইল যে গ্রিয়ারসনই সেই দলের নেতা। ছদ্মবেশী বণিকদ্বয় তাহাদের পণ্যদ্রব্যজাত তাহাদের ভৃত্যবর্গের হস্তে ন্যস্ত করিয়া সেনাদলের অনুসরণ করিতে লাগিল; তাহাদের লক্ষ্য গ্রিয়ারসনকে সুবিধামতো পাইলেই সংহার করা।

গ্রিয়ারসন এক্ষণে পলিতকেশ বৃদ্ধ। তাঁহার চঞ্চল মুখশ্রী, নীলাভ নয়নজ্যোতি গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। পুরাতনের মধ্যে আছে তাঁহার সেই শিকারপ্রিয়তা ও ধূমপান, এবং যৌবনের উদ্দাম উৎসাহ। গ্রিয়ারসনের এক কন্যা ও তিনটি পুত্র। গ্রিয়ারসন কন্যার নাম রাখিয়াছেন করিমা। তাঁহার হৃদয়ের বৃশ্চিকদংশনের ইহাই বুঝি নিদর্শন।

উদ্দিষ্ট সেনানিবাসে পৌঁছিতে এখনো দুই দিনের পথ বাকি রহিয়াছে।

গ্রিয়ারসন বিশ্রামার্থ ছাউনি ফেলিয়াছেন। ছাউনির অনতিদূরে জঙ্গল ও জলাভূমি। ইহা দেখিয়া শিকারপ্রিয় গ্রিয়ারসন স্থির থাকিতে পারিলেন না, দুইজন আরদালী সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে শিকার করিতে বাহির হইলেন; তাঁহার শত্রুদ্বয় অদৃশ্যভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল; গ্রিয়ারসন কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই।

গ্রিয়ারসন বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটা প্রকাণ্ড ঝিল দেখিতে পাইলেন। ঝিলে জলচর পক্ষীর অভাব ছিল না।

গ্রিয়ারসন ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া অনুচরদ্বয়কে ঘুরিয়া যাইয়া দুইদিক হইতে পক্ষী তাড়াইয়া আনিবার অনুজ্ঞা দিলেন এবং স্বয়ং হাঁটু পর্য্যন্ত জলকর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া কতকগুলা শরঝাড়ের পশ্চাতে লুক্কায়িত রহিলেন। ওয়াজিরিদ্বয়ও অনতিদূরে লুক্কায়িত ছিল, গ্রিয়ারসন অনুচর-বিযুক্ত হইবামাত্রই তাঁহাকে আসিয়া আক্রমণ করিল। জলের ভিতর দিয়া দৌড়িয়া আসার শব্দে গ্রিয়ারসন মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে দেখিলেন এবং তাহাদিগের পরিচ্ছদ দেখিয়াই তাহাদের জাতি নির্ণয় করিতে পারিলেন। তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, "তোমরা কি চাও?"

"করিমার মৃত্যুর প্রতিহিংসা," বলিয়া ওয়াজিরিদ্বয় নগ্নছুরিকাহস্তে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল।

"করিমার মৃত্যু" শুনিয়া গ্রিয়ারসনের চিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল; কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, তাহাদের কথার উত্তরস্বরূপ দুনলা বন্দুকের গুলি তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিলেন। ওয়াজিরিদিগের সৌভাগ্য ও গ্রিয়ারসনের দুর্ভাগ্যবশত উভয় নলার গুলিই এক ব্যক্তি ললাটে ও বক্ষে গ্রহণ করিয়া জলে পড়িল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ততক্ষণে গ্রিয়ারসনের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; গ্রিয়ারসন কটিবন্ধ হইতে টোটা লইয়া বন্দুকে দিবার অবসর প্রাপ্তির জন্য পশ্চাৎপদ হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শিকারের আশ্রয় শর ও নলের ঝাড় এক্ষেত্রে তাঁহার

আত্মরক্ষায় বাধা ও অন্তরায় হইল। গ্রিয়ারসন নিরুপায় হইয়া বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া শত্রুকে আঘাত করিলেন; ওয়াজিরি সেই আঘাত বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া গ্রিয়ারসনকে বিদ্ধ করিল, তিনি পতিত হইলেন। দস্যু তাঁহাকে প্রাণে মারিয়া তাঁহার বন্দুকটি উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করিল; ভগ্ন লম্বমান হস্তের যন্ত্রণাকে গ্রাহ্য করিল না।

আরদালীদ্বয় বন্দুক আওয়াজের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, সাহেব বুঝি উপযুক্ত শিকার স্বয়ংই জুটাইয়া লইয়াছেন। তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে সাহেব স্বয়ংই শিকার হইয়াছেন। তাহারা শিকার তাড়াইয়া লইয়া আসিল, সাহেব তবু নিস্তব্ধ। অবশেষে তাহারা আসিয়া সাহেবকে হত দেখিয়া ভীত হইল; মৃত ওয়াজিরিকে দেখিয়া ব্যাপার অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। তৎপরে তাহারা সাহেব ও মৃত ওয়াজিরিকে বহন করিয়া ছাউনিতে উপস্থিত হইল। মৃত ওয়াজিরিকে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া আরদালী বেচারারা খুনের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল।

হন্তা পলাতক ওয়াজিরি বহুপরিশ্রম, অনাহার, অনিদ্রা সহ্য করিয়া, বন, জলা, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, স্বকীয় আড্ডায় উপস্থিত হইয়া আপনার কৃতকার্য্যতার বাহাদুরী লইল। ওয়াজিরিপল্লীতে তাহাদের "সরমের কথা" ভুলিবার আজ শুভ দিন! তাহাদের বিশাল ভোজের আয়োজন হইল।

মিসি-গ্রিয়ারসন পতির মৃত্যুসংবাদ পাইল। কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যথারীতি শোক করিল। পরে সামরিক বিভাগ হইতে অনশন-ক্লিষ্ট ভারতের শোণিতসম অর্থের মোটা পেন্সিয়ান আদায় করিয়া কন্যা-পুত্র সঙ্গে দ্বিতীয় পতির অন্বেষণে বিলাত যাত্রা করিল। এদেশ হইতে গ্রিয়ারসন-পরিবারের চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। কেবল পেশোয়ার নগরের সমাধিপ্রাঙ্গনের বক্ষে প্রস্তরফলকের মলিন অক্ষরপংক্তিতে গ্রিয়ারসনের

নাম খোদিত রহিয়াছে। আর ওয়াজিরি অধিত্যকায় করিমার উপলস্তূপ-সমাধির উপর দীনশরণ পরমেশ্বরের বিস্ফারিত করুণনেত্রের মতো, সুনীল প্রশান্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে।

সম্পাদকের বিপদ

বিশ্বশরণ দেব এম. এ. পাশ করার পর সম্পাদক-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা মাসিক,—নাম, "ধরণী"। সম্পাদক-খ্যাতি ও অর্থ উভয়ই "ধরণী"র সাহায্যে তাঁহার অর্জ্জিত হইয়াছিল, আর অর্জ্জিত হইয়াছিল, একটি পত্নী।

"ধরণী"র লেখকলেখিকার মধ্যে লাবণ্যপ্রভা অন্যতমা। তাঁহার কবিতায় পাপিয়ার গানের মতো কি একটা সুখকর বিষাদভাব মাখানো থাকিত; তাঁহার রচনায় ভাদ্রের নদীর মতো কি একটা উদ্বেলভাব প্রবাহিত হইত। সম্পাদক ইঁহার রচনার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন; প্রতিমাসে ইঁহার একটি রচনা প্রকাশিত না হইলে সে সংখ্যা যেন অসম্পূর্ণ বোধ হইত। বাস্তবিক, ধরণীর প্রতিপত্তি-প্রতিষ্ঠায় লাবণ্যপ্রভার রচনা অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল। লাবণ্যপ্রভার রচনা যখন সম্পাদকের নিকট অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল, তখন সম্পাদক লেখিকাকে লেখা জোগাইতে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। লাবণ্য তখন বি. এ. ক্লাশে পড়েন; তাঁহার আত্মীয়ের মধ্যে দূর সম্পর্কীয়া একমাত্র মাসিমাই সম্বল, সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের জন্য গুটিকয়েক নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীদিগকে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও চিত্রাদিবিদ্যা শিক্ষা দিতে হইত। এজন্য তাঁহার অবসর

বড় একটা বাজে কাজে ব্যয় করিবার মতো উদ্বৃত্ত থাকিত না। এই জন্য "ধরণী"-সম্পাদকের বহু তাগিদ তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত; এবং বাধ্য হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎও দিতে হইত। পত্র-প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। সম্পাদক সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ধরণীর বৃত্তি-কোষ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং লাবণ্যও কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়া সুলিখিত প্রবন্ধসকলে ধরণীর কলেবর পুষ্ট করিতে লাগিলেন।

সম্পাদকের ঈদৃশ আগ্রহ দেখিয়া লেখিকা কিছু গর্ব্বানুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু সম্পাদকের সরল, অমায়িক ব্যবহার, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লেখিকাকেও তাঁহার গুণ-পক্ষপাতী করিয়া তুলিল।

বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল; লেখিকা-সম্পাদকের ঘনিষ্ঠতা বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছে। লাবণ্য এইসকল চিত্তবিক্ষেপকারণপরম্পরায় বি. এ. পাশ করিতে পারিলেন না; কলেজও ত্যাগ করিতে হইল।

এতদিন তিনি মাসির নিকট কদাচ যাইতেন, বোর্ডিঙেই তাঁহার বাস ছিল। এক্ষণে সেই মাসির বাড়ীই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। যদিও নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করিতেন, তথাপি মাসি তাঁহাকে গলগ্রহ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; এবং বিবাহের জন্য বড় বেশি তাগাদা আরম্ভ করিলেন; কারণ লাবণ্যকে বাড়ী হইতে ভদ্রভাবে তাড়াইবার এই একমাত্র উপায়। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া লাবণ্য বলিয়া ফেলিলেন, "আমি বিশ্বশরণ বাবু ভিন্ন আর কাউকে বিয়ে করব না। তোমার যদি এতই অসহ্য হয়ে থাকে, আমি কোনো ভদ্র পরিবারে একটা চাকরী জোটাতে পারলেই, তোমার বাড়ী থেকে চলে যাব।" এই উপলক্ষে মাসি বোনঝিতে সেদিন খুব বচসা হইয়া গেল। খবর বিশ্বশরণ বাবুর নিকট পৌছিল; এবং তিনি বিনা আড়ম্বরে পরের ডাকেই দুই খানি পত্র—

একখানি লাবণ্যপ্রভার নিকট, ও আর এক খানি তাঁহার মাসির নিকট—লাবণ্যপ্রভার প্রাণিপার্থী হইয়া লিখিয়া ফেলিলেন। অচিরে সম্পাদক ও লেখিকার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। লাবণ্যপ্রভা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশরণের সহধর্ম্মিণী হইয়া উঠিয়াছেন। বিশ্বশরণ বাবু আজ "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ", কাল "পুনা শিল্পমেলা", পরশ্ব "জাতীয় মহাসভায়" নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া দেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান, আর লাবণ্যই প্রকৃতপক্ষে ধরণীর সম্পাদকত্ব করেন। ইহাতে গর্ব্বিতার অহঙ্কার বাড়িতে লাগিল। বিশ্বশরণ যত খ্যাতিসম্পন্ন, দেশবিশ্রুত হইতে লাগিলেন, তাঁহার নম্রতা ও বিনয় তত বাড়িতে লাগিল, কিন্তু লাবণ্যপ্রভা ক্রমশ উদ্ধত হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বশরণ বড় একটা সামাজিক লোক ছিলেন না; মিষ্টভাষী ও বিনয়ী হইলেও বড় অল্পভাষী ছিলেন। তাঁহার জীবনে কোনো কিছুরও একটা আড়ম্বর ছিল না। তিনি নীরবে জ্ঞানার্জ্জন করিতেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতে সেসকল সাধারণে প্রকাশ হইয়া পড়িত। বিশ্বশরণের অন্তর প্রেমপারাবার হইলেও, তিনি প্রেমের খেলা খেলিতে জানিতেন না। তিনি জানিতেন না যে, স্ত্রীলোককে স্পষ্ট কথায় প্রকাশ করিয়া বলিয়া বুঝাইতে হয় যে "আমি তোমায় বড় ভালো বাসি, তুমি মমৈকআশ্রয়"; তিনি জানিতেন না যে ঐসকল চাটুস্তুতি খতদলিলের মতো মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া দিয়া নিজের ঋণ স্বীকার করিতে হয়। নভেলি-নায়কের মতো প্রণয়িণীর দোদুল-অলক দেখিয়া বিভোর হইতে হয়, তাহাও তিনি বুঝিতেন না; সময়ে অসময়ে স্ত্রীকে সোহাগ দেখাইতেও তিনি জানিতেন না। জানিতেন না বলিয়াই, লাবণ্যকে—নভেল পড়া নব্যা স্ত্রীকে—সুখী করিতে পারেন নাই। লাবণ্য মনে করিতেন সমান-বয়স্ক না হইলে বুঝি চিত্তবন্ধন সম্পূর্ণ হয় না। উভয়ের বয়সের তারতম্য একযুগ, বিশ্বশরণ

৩৪ ও লাবণ্য ২২ বৎসর। লাবণ্য রুদ্ধ অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের ন্যায় অন্তরে ভীষণ দাহ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

বিশ্বশরণ ধরণীকে নবীনতা দান করিবার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্য, লঙ্কা ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যটন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। তিনি দুইবার ধরণীর পৃষ্ঠাপূরণের জন্য তাঁহার ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; কিন্তু ললিতছন্দগ্রথিত কোনো প্রেমপত্র লাবণ্যর জন্য আসে নাই। লাবণ্যর নিকট ইহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তাঁহার স্বামী পত্রিকাসম্পাদনের জন্যও ত কোনো উপদেশ পাঠাইতে পারিতেন! লাবণ্য স্বামীর সহিত ঝগড়া করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন। এই নিস্তব্ধতায় যে নির্ভর ও বিশ্বাস প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

বিশ্বশরণ গৃহে ফিরিয়াছেন। লাবণ্য ভালো করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। একদিন বিশ্বশরণ একটা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "আজই এটা দেখে দিতে হ'বে; কাল প্রেসে যাওয়া চাই।" লাবণ্য তাঁহার প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "আমি পারব না; তুমি সম্পাদক, তুমি দেখ গে না।" এরূপ ব্যবহার এই নূতন। তথাপি সম্পাদক হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যে সম্পাদকের সহধর্ম্মিণী।"

এই হাসিই কাল হইল। স্ত্রীলোক তাহাদের ক্রোধকে উপেক্ষা করা বড় সহজে সহ্য করিতে চাহে না। দর্পিতা মুখরা লাবণ্য বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, না, আমি তোমার বিনামূল্যে ক্রীত দাসী। ৩।৪ বৎসরমাত্র বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে তোমার প্রেমে অবসাদ এসেছে, আমি কি বুঝতে পারি না? তুমি কখনো আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেছ, না, সস্নেহ ব্যবহার করেছ? তোমার সঙ্গে যেন আমার মনিব-চাকর সম্বন্ধ। আমি আপনি ধরা দিয়েছিলাম বলে

এই লাঞ্ছনা! ধরণী-সম্পাদক বলে' তোমার বড় অহঙ্কার; কিন্তু ধরণীর যে খ্যাতি ধরছে না, সে ত আমারই জন্যে। সে দিন মনে পড়ে কি, যে দিন ধরণীর প্রাণরক্ষার জন্যে ভিক্ষুকের মতো আমার লেখনীর উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে আনতে? আমি স্থির করেছি, আমি তোমার ও "ধরণী"র সংস্রব ত্যাগ করব; তখন বুঝবে আমাবিহনে তোমাদের কিরূপ অবস্থা হয়।" বিশ্বশরণ নির্ব্বাক, কিছু উন্মনস্ক। ইহাকে উপেক্ষা মনে করিয়া দ্বিগুণিত অভিমানে উত্তেজিত হইয়া লাবণ্যপ্রভা বলিলেন, "তোমার গৃহস্থালী বুঝিয়ে দিয়ে যাব বলে' তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। এখন আমাকে ছুটি দেও।"

বিশ্বশরণ বলিলেন, "তোমার মন কর্ম্মক্লান্ত হয়েছে; কিছু দিন না হয় মাসির বাড়ী থেকে এস।" লাবণ্য কোনো উত্তর দিলেন না। বিশ্বশরণ বলিলেন, "আমায় আজই কলকাতা যেতে হবে; সেখান থেকেই আমি কাল পঞ্জাবে যাব।" বিশ্বশরণ শ্রীরামপুরে থাকিতেন।

লাবণ্য। আমাকে অব্যাহতি দিয়ে যাও, আমিও আজই যাব।

বিশ্বশরণ। তুমি যাতে সুখী থাক তাই কোরো; আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। আমার গৃহ তোমারই; যখন ইচ্ছা হবে ফিরে এসে এই গৃহের গৃহিণীপদ আবার গ্রহণ কোরো।

লাবণ্য শেষাংশ গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, "গৃহসামগ্রী কে রক্ষা করবে?" বিশ্বশরণ বলিলেন, "চাকরেরা রইল।" আর কোনো কথা হইল না। প্রেমের শ্মশানে নিস্তব্ধতা প্রাণকে যেন চাপিয়া ধরে। বিশ্বশরণ প্রস্থান করিলেন।

তখন লাবণ্য উঠিলেন; একবার গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন; সর্ব্বত্র তাঁহার গৃহিণীসুলভ নিপুণতা বিদ্যমান রহিয়াছে। গৃহসংসার ছাড়িয়া, গৃহস্থালী ভৃত্যের ভরসায় ফেলিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন, এ চিন্তায় তিনি

ব্যথা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও সেই গর্ব্বিতার ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না। তিনি নিজস্ব দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত যেন প্রতিপদে ব্যথিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার অতীত ও বর্ত্তমান বড় মধুময় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ভবিষ্যৎ যেন শুধু শূন্য, শুধু অন্ধকার। বিশ্বশরণ কি বাস্তবিকই তাঁহাকে ভালোবাসেন না? কিন্তু তথাপি তিনি যখন এই পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহার মনে কি হইবে? সমস্তদিনের কর্ম্মাবসানে ক্লান্ত সম্পাদক কোন্ উৎসাহে, কাহার জন্য গৃহে ফিরিবেন? যাক্, আর চিন্তা করা যায় না, যাহা হইবার হইবে।—লাবণ্যপ্রভা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একটার পর একটা বাক্স খুলিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। একটা বাক্স খুলিয়া কতকগুলি চিঠির উপর নজর পড়িল; সেগুলি চিরপরিচিত; তাহাদের বুকে কত সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনী অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই পরিচিত হস্তাক্ষর। পত্রগুলি কতক বিবাহের পূর্ব্বে কতক পরে বিশ্বশরণের লেখা। লাবণ্য এক একখানি করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বের গুলিতে কি নম্রতা, কি ভদ্রতা, কি শিষ্টতা; তারপর সেই অনাড়ম্বর বিবাহপ্রার্থনায় কি সরলতা ও একাগ্র বিশ্বাস! পরের চিঠিগুলিতে কি এক অব্যক্ত প্রেম ও নির্ভর এবং চিত্তের অগাধতা অলক্ষ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠি পড়িতে পড়িতে একগাছি ছোট বকুলের মালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বিবাহের পর স্বল্পভাষী সম্পাদক সেই মালাগাছি তাঁহারই গলায় পরাইয়া বলিয়াছিলেন, "বকুল শুকিয়ে গেলেও, রূপহীন হলেও গন্ধহীন হয় না; আমাদের প্রেমও তেমনি বিপদে সম্পদে, রোগে শোকে অটুট অক্ষুণ্ণ থাকবে।" লাবণ্যপ্রভার চক্ষে প্রত্যেকটি বকুল ফুল অক্ষরপরম্পরায় যেন ঐ কথা কয়টিই চিত্রিত করিয়া তুলিল। গর্ব্বিতার চক্ষে জলধারা বহিল।

বেচারা একখানা সোফায় পড়িয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। সে আপনার

ভ্রান্তি অনুভব করিতে লাগিল; সে নিজেরই ত্রুটি বুঝিতে পারিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া খানিক কাঁদে, আপনার ভ্রম স্বীকার করে, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লয়। ধরণীসম্পাদক বিশ্বশরণের স্ত্রী হওয়া সে এখন সৌভাগ্য ও গর্ব্বের কারণ বলিয়া অনুভব করিল।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘড়ি দেখিলেন; আছে, আছে—এখনো সময় আছে। তিনি আজ পত্র লিখিলে পঞ্জাব যাত্রার পূর্ব্বে বিশ্বশরণ পত্র পাইতে পারেন, এখনো সময় আছে, আছে। তিনি যদি অভয় দেন, লাবণ্য শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়া স্বামীর ক্ষমাবাক্য শুনিতে প্রস্তুত আছেন। লাবণ্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও বিনয়ের সহিত একখানি প্রণয়গর্ভ পত্র লিখিয়া ফেলিলেন; এরূপ সরস পত্র শুধু প্রেমিকের, না, শুধু প্রেমপূর্ণা রমণীর লেখাই সম্ভব। তিনি লিখিলেন, 'আমার বয়স ও প্রেমের উচ্ছলতায় যে ত্রুটি, যে সন্দেহ ঘটিয়াছিল তাহা অপগত হইয়াছে। যদি তুমি ক্ষমা কর, আমি আবার সহধর্ম্মিণীর কার্য্য প্রাণপণে সম্পন্ন করিব।' পত্র শেষ হইল। গুটিকয়েক শুষ্ক বকুল ফুল গত জীবনের সোহাগবচনের স্মারক বলিয়া পত্র মধ্যে ভরিয়া দিলেন। পত্র ডাকে দেওয়া হইল।

লাবণ্যের চিত্ত এখন নির্ম্মল, প্রেমে প্রাণ থম্ থম্ করিতেছে। প্রাতে উত্তর আসিবে। সমস্ত রাত্রি উদ্বেগ ও আগ্রহে কাটিয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই লাবণ্য প্রস্তুত হইয়া পত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ সূর্য্য বড় বিলম্বে উঠিল; সূর্য্য যদি উঠিল, ডাকহরকরা আজ আরো বিলম্ব করিতে লাগিল; ঘড়িটাও আজ বড় "স্লো" চলিতেছে। বহুবার বাড়ীর চাকরেরা ডাকঘরে গিয়া ফিরিয়া আসিল, ডাক এখনো বিলি হইতে বিলম্ব আছে। ভৃত্য ডাকঘর পর্য্যন্ত গিয়াছিল ত? এক চাকরের পর অন্য চাকর প্রেরিত হইতে লাগিল। অবশেষে একজন কতকগুলি পত্র আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। লাবণ্য সবগুলি হাতে লইয়া

তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া গেলেন। হাঁ, আছে, আছে, সেই চিরপরিচিত হস্তাক্ষর। তাড়াতাড়ি পত্র খুলিতে আরো অধিক বিলম্ব হইয়া গেল। পত্রমধ্যে কতকগুলি বকুল ফুল ও একটুকরা কাগজের উপর রবারষ্ট্যাম্পে ছাপ দেওয়া, "অগ্রাহ্য। ক্ষমাপ্রার্থী ধরণী-সম্পাদক।"

কি দারুণ সংবাদ! তাঁহার প্রণয়ভিক্ষার প্রতি কি দারণ পরিহাস! আর না, সব শেষ হইয়া গেল। পত্রে নিজের হস্তাক্ষর নাই, নিজের নামটা পর্য্যন্ত নাই। কি উপেক্ষা! তিনি আজ হইতে তাঁহার নিকট ধরণী-সম্পাদক, স্বামী নহেন। বেশ, তাহাই হউক। সেই ঘরের বাতাস লাবণ্যর নিকট বিষাক্ত বোধ হইতে লাগিল; তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। লাবণ্যর দৃঢ় চিত্ত ইহাতে দুর্ব্বল না হইয়া আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার নিজস্ব দ্রব্যাদি লইয়া কলিকাতায় এক সতীর্থ বন্ধুর বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিছু দিনের মধ্যেই এক ধনাঢ্য পরিবারে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাম এক্ষণে প্রভাবতী।

তিনি যে পরিবারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহারা অত্যল্প কাল পরেই ডিহিরিতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্থান করিলেন। সোণ নদের উপরেই একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাংলায় তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং, লাবণ্য এখন ডিহিরিতে।

এখানে আসিয়া লাবণ্য কয়েকটি প্রবন্ধ প্রভাবতী নাম দিয়া "ধরণী" ও অন্যান্য মাসিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোনো কোনো পত্রিকা প্রাপ্তি স্বীকার করাটাও ভদ্রতাবিগর্হিত মনে করিলেন। কোনো পত্রিকা বা অগ্রাহ্য করিয়াও দয়া করিয়া খবরটা দিলেন। কেবল ধরণী-সম্পাদক ধন্যবাদ দিয়া এক বিনীত পত্র ও তৎসঙ্গে প্রবন্ধের পারিশ্রমিক অর্থ প্রেরণ করিলেন। লাবণ্যের রচনাসাফল্যের যে একটা অহঙ্কার ছিল, তাহা যথেষ্ট খর্ব্ব হইয়া পড়িল। লাবণ্য বুঝিতে পারিলেন যে ধরণীর

সাহায্যে তাঁহার নাম যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহারই মূল্য বা আদর, কিন্তু তাঁহার রচনার এতাদৃশ কোনো শক্তিই নাই, যাহাতে প্রভাবতী নামেও তাহা সর্ব্বত্র আদৃত হইতে পারে। কিংবা, হয় ধরণীর সম্পাদকই একমাত্র গুণগ্রাহী, তাঁহার নিকট নামের খাতির নাই, নয় ত তাঁহার স্বামী তাঁহার ছদ্মনামেও তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এইসকল চিন্তাপরম্পরায় লাবণ্যের বিরহব্যাকুল চিত্ত বিশ্বশরণকে উজ্জ্বল চিত্রে ফলিত করিয়া তুলিল। তাঁহার গর্ব্বোদ্ধত চিত্ত ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, অনুতপ্ত, হইয়া উঠিল। স্বামীর সহিত পুনর্মিলিত হইবার একটা ক্ষুধিত বাসনা মনকে পীড়া দিতে লাগিল। এইরূপে আরো কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

বিদেশ স্বদেশীবন্ধুত্বের উর্ব্বরক্ষেত্র। লাবণ্যদের বাংলার অতি নিকটে আর একটি বাংলায় একটি বাঙালী পরিবার বাসা লইয়াছিলেন। এই পরিবারের একটি মহিলার নাম পুণ্যপ্রভা। তিনি লাবণ্যের সমবয়সী, এবং উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু হইলেও অভিমানিনী লাবণ্য তাঁহার নিকট প্রভাবতী নামেই পরিচিত ছিলেন।

উভয় বাংলার মধ্যে একটা তৃণাস্তৃত ছোট মাঠ মাত্র ব্যবধান। একদিন লাবণ্য ও পুণ্য উভয়ে সেই মাঠে সোণের ধারে ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে নানাবিধ আলাপ করিতেছিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সূর্য্য সহরের পশ্চাতে পড়াতে নদীবক্ষের তরল অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, মাঠের ঘাসের মধ্যে একটা ঝিল্লি একঘেয়ে কর্কশ চীৎকার করিতেছিল; গাং-শালিক কলরব করিয়া নদীর পাড়ে গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইতেছিল। কাক বক প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী সরবে ও নীরবে ঝাঁক বাঁধিয়া নীড় অভিমুখে ছুটিয়াছিল। নদীবক্ষে দুই একখানি নৌকা পাল তুলিয়া মন্থরগমনে

চলিতেছিল; অন্ধকারমাখা পালগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল; পুণ্যপ্রভা ও লাবণ্যের কথোপকথন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিক্রমণ করিয়া সাহিত্য আশ্রয় করিল এবং শীঘ্র মাসিক সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বসিল। মাসিক সাহিত্যালোচনায় ধরণীর নামোল্লেখ অনিবার্য্য; ধরণীর সম্পর্কে সম্পাদকের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়িল। এককালে যে ধরণী লাবণ্যের স্বহস্তলালিত যত্নের সামগ্রী ছিল, যে সম্পাদক তাঁহারই আরাধ্য স্বামী, তাহাদের সম্বন্ধে নিঃসম্পর্কভাবে কথা কহিতে লাবণ্যর কেমন বাধো বাধো বোধ হইতে লাগিল, মন অস্থির হইয়া উঠিল, হৃদয়ে গুরু স্পন্দন আরম্ভ হইল, মুখ চোখ লাল হইয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার তিমির গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পুণ্যপ্রভার লক্ষ্য করিবার কোনো কারণ ছিল না বলিয়া, লাবণ্য ধরা পড়িলেন না। কথোপকথন চলিতে লাগিল। পুণ্য বলিলেন, "ধরণী-সম্পাদককে তুমি চেন? তিনি কেমন লোক?"

লাবণ্য রুদ্ধশ্বাসে অতি সংযমের সহিত বলিলেন, "আমি তাঁকে খুব চিনি। তাঁর মতো ব্যক্তি দুর্লভ!"

পুণ্যপ্রভা বলিলেন, "তিনি ত' বিবাহিত?"

লাবণ্য। হাঁ।

পুণ্য বলিলেন, "তাঁহার চরিত্রটা কিন্তু বিবাহিতের ঠিক উপযুক্ত নয়।"

এই কথায় লাবণ্যর সর্ব্বশরীরের রক্তস্রোত ফিরিয়া যাইয়া বিদ্রোহীর মতো সবলে হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করিল। লাবণ্যর মুখ হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল। ইহাতে পুণ্যপ্রভার মুখে একটা কুটিল হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কি হ'ল?' লাবণ্য সে হাসি অন্ধকারে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কর্ণে যে বিরাট ঝিল্লি ঝঞ্ঝনা তুলিয়াছিল, তাহা পুণ্যপ্রভার বিস্ময়-

প্রশ্নও শুনিতে দিল না। ক্ষণেক পরে লাবণ্য একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "তোমার ওরূপ ধারণা কেন হল ?"

পুণ্য আবার হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমার বড় ইচ্ছা হয়েছিল যে, ধরণীতে আমার একটা কবিতা ছাপা হয়। প্রতিমাসেই এক একটি পাঠাতে লাগলাম, সবগুলিই অগ্রাহ্য হয়ে ফিরে আসতে লাগল। বার বার বিফলমনোরথ হওয়াতে আমারো খুব জেদ বেড়ে গেল। আমি স্থির করলাম যে, যে পর্য্যন্ত না আমার প্রত্যেক কবিতা ধরণী আপিস ঘুরে আসে, সে পর্য্যন্ত আমি নিবৃত্ত হব না। গত বৎসর আমার এক কবিতা ফিরে এল। কিন্তু ভাই লজ্জার কথা কি বলব, তার সঙ্গে এক প্রেমপত্র! ছি! অপরিচিতা লেখিকাকে ওরূপে পত্র লিখলে কি করে'? আমি সেই অবধি কবিতা পাঠানো বন্ধ করেছি।"

লাবণ্যর ওষ্ঠতালু শুষ্ক, মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, "আমাকে একবার সে চিঠি দেখাতে পার ?"

পুণ্য মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "এত দরদ !" প্রকাশ্যে বলিলেন, "তা পারব না কেন ? একদিন খুঁজে দেখাব ; কোথায় আছে ঠিক নেই তো ; সেই একদিন পড়ে কোথায় ফেলে রেখেছি ঠিক মনে নেই।" এই বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

লাবণ্যের এক্ষণে মানসিক ভাব যেরূপ, তাহাতে তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারেন না। তিনি অতিমাত্র উদ্বেগের সহিত বলিলেন, "আমি এখন তোমার বাংলায় গেলে কি তুমি দেখাতে পার না ?"

পুণ্যর মুখে আবার ক্রূর হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "চল, খুঁজে দেখব।"

পুণ্য লাবণ্যকে তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। একটা মস্ত পেটমোটা কেরোসিন ল্যাম্প স্তিমিত-লোচনে আফিংখোরের মতো ঝিমাইতেছিল; পুণ্য ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহার কান মলিয়া দিলেন, অমনি সে ক্রোধপ্রদীপ্ত লোচন বিস্তার করিয়া উগ্রভাবে চাহিয়া দেখিল। পুণ্য একটা ষ্টীল-ট্রাঙ্ক খুলিয়া তন্মধ্য হইতে একটা ছোট হাতবাক্স বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে গুটিকয়েক সৌখীন গহনা ও একতাড়া চিঠি লাল রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধা। ফিতা খুলিয়া চিঠির গোছা হইতে স্বচ্ছন্দে বাছিয়া একখানা চিঠি পুণ্য লাবণ্যকে দিলেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তিনি অজ্ঞানতার ভাণ করিয়াছিলেন। লাবণ্য এসকল কিছুই লক্ষ্য করিলেন না। এই কয়মুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। ত্রস্ত কম্পিতহস্তে চিঠি গ্রহণ করিয়া মেঝেতে বসিয়া আলোর নীচে ধরিলেন। খামের উপর ধরণী ও আফিসের নাম ঠিকানা ছাপানো; বিশ্বশরণের হস্তাক্ষরে পুণ্যপ্রভার নাম ঠিকানা লেখা। কম্পিতহস্তে চিঠি খামমুক্ত করিয়া ফেলিলেন। প্রথমেই তাঁহার চক্ষু সম্বোধনের উপর পড়িল, লেখা রহিয়াছে—"প্রাণের প্রভা!" এ কাহার পত্র? উহা কি তাঁহার সেই চিরন্তন প্রিয় সম্বোধন অপরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে? আগ্রহে পত্র পড়িতে লাগিলেন,—

"তোমার পত্র পাইয়া সুখী ও আশ্বস্ত হইলাম। আমি চিরদিন তোমারই; আমার স্নেহ প্রেম অটুট আছে ও থাকিবে। বকুলফুলের জীবনান্ত পর্য্যন্ত সৌরভ থাকে, আমাদেরও প্রণয় উভয়ের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। আমি যে তোমায় ভালো বাসি এ কথা তুমি বুঝিতে পার নাই বলিতে পারি না। আমিও তোমার স্বভাব যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে আমার প্রতি তোমার প্রসক্তি প্রগাঢ়, তাহা ক্ষণিকের কুহেলিকায় ঢাকা পড়িলেও কখনও চিরতিমিরগ্রস্ত হইবে না। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এতটা নির্ভর-

শীল হইয়া পড়িয়াছি যে, একের বিহনে অপরের জীবন অচল হইয়া উঠিবে। তুমি চিরদিন আমারই, আমিও একান্ত তোমারই। যদি আমার কোনো অন্যায় হইয়া থাকে ক্ষমা করিয়ো। ক্ষমা রমণীর সহজ ধর্ম্ম—মানুষের ত্রুটি পদে পদে। আশা করি এই কথাটা ভবিষ্যতে মনে রাখিবে। আমি আজই পঞ্জাব যাইব। অনেক কাজ এখনো করিতে বাকি আছে। অতএব আজ এই পর্য্যন্ত। তোমারই দেবতা। পুনশ্চ—আমাদের প্রেমের অটুট বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ বকুলফুলের গুটিকয়েক আমি রাখিয়া বাকি কয়েকটি তোমায় পাঠাইলাম। ইতি।"

এই পুনর্লিখিত অংশ নীল পেন্সিলে লেখা—ব্যস্ততার স্পষ্ট নিদর্শন। লাবণ্য বুঝিতে পারিলেন, ব্যস্ততার সামান্য ভ্রমে কি মহা অনর্থপাত ঘটিয়াছে। লাবণ্য চিঠিখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই সস্নেহ সম্বোধন, সেই চিরপরিচিত নাম স্বাক্ষর। লাবণ্য স্বামীকে সম্বোধন করিতেন, "আমার দেবতা," সেই সূত্রে বিশ্বশরণ দেব লিখিতেন, "তোমার দেবতা"। পত্রের প্রতি কথায়, প্রতি ছত্রে, কি বিশ্বাস, কি নির্ভর, কি একনিষ্ঠতা, কি সরলতা, কি ভালোবাসা। তুচ্ছ অভিমানের জন্য এই দেড় বৎসর কাল কি কষ্টই না নিজে ভোগ করিয়াছেন, স্বামীকে ভোগ করাইয়াছেন। লাবণ্য ক্রোধ-রক্তিম নেত্রে পুণ্যাকে বলিলেন "তুমি এ চিঠি আমায় এতদিন দেখাওনি কেন? এই দেড় বৎসর আমরা যে মনস্তাপ আর কষ্ট পেয়েছি, তার কারণ তুমি। আমার এ চিঠি চেপে রাখবার তোমার—তোমার কি অধিকার ছিল?" পুণ্য ত' অবাক্! কিন্তু তিনি মনে মনে বড় মজা অনুভব করিতেছিলেন। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন "ছি, তোমার চরিত্র এমন?" লাবণ্য আর কিছু না বলিয়া চিঠিখানা লইয়া একেবারে ষ্টেশনে চলিয়া গেলেন। ধরণী আপিসে 'আর্জেণ্ট প্রিপেড্ টেলিগ্রাম' করিলেন, ধরণী-সম্পাদক এক্ষণে কোথায় আছেন?

লাবণ্য চলিয়া গেলে পুণ্য খুব এক চোট হাসিয়া লইল এবং তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক সম্ভব অসম্ভব অনেক ঘটনা কল্পনা করিতে লাগিল।

রাত্রি ১২টা। লাবণ্যের বাংলায় সকলে নিদ্রিত; কেবল লাবণ্য একটা ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া লইতেছেন। এমন সময় বাহিরে কে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। এই ডাকাডাকিতে অনেকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। একজন ভৃত্য একটা লাল খাম আনিয়া উপস্থিত হইল। গৃহস্বামী হাতে লইয়া বলিলেন, "এত রাত্রে টেলিগ্রাম কোথা হইতে আসিল?" আলোতে নাম পড়িলেন, "প্রভাবতী"। তিনি লাবণ্যকে উহা দিয়া উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। লাবণ্য মনে মনে পড়িলেন, "এডিটার সোমবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবেন।" গৃহস্বামী কহিলেন, "কি, খবর কি?" লাবণ্য নতমুখে বলিলেন, "একটা বিশেষ দরকারে আমায় আজই কলকাতায় যেতে হবে।" টেলিগ্রামে আহ্বান আসিলে ওজর থাকিতে পারে না। লাবণ্য সকলের নিকট বিদায় লইয়া ২।২৮ মিনিটের গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার সময় হাবড়াতে পৌঁছিয়া, একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া একেবারে ধরণী আপিসে আসিয়া উপস্থিত। গাড়ি হইতে নামিতে তাঁহার পা কাঁপিতে লাগিল। এতক্ষণ যে উৎসাহ ছিল, তাহা বাঞ্ছিতের দ্বারে আসিয়া নানাবিধ ভাবের তলে ঢাকা পড়িয়া গেল। এক্ষণে রমণী-সুলভ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল। গাড়ী হইতে তিনি সম্পাদককে দেখিতে পাইতেছিলেন। এই দেড় বৎসরে তাঁহার বয়স দশবৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। লাবণ্য ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিতেছেন, এমন সময় একজন দ্বারবান আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। এক্ষণে আর গত্যন্তর নাই; তিনি দ্বারবানকে কার্ড দিলেন "প্রভাবতী"। সম্পাদক অল্পক্ষণ পরেই তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, "লাবণ্য"। লাবণ্য বুঝিলেন, প্রভাবতী নামের

মুখোশ পরিয়াও তিনি চতুর সম্পাদকের নিকট আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। লাবণ্য এই স্নেহমাধুর্য্যে আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, অশ্রুসাগরে জোয়ার ডাকিয়া গেল। বিশ্বশরণ তাঁহাকে গাড়ি হইতে নামাইয়া একটা ঘরে লইয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে, ভাব প্রশমিত হইলে লাবণ্য বলিলেন, "আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।"

বিশ্বশরণ বলিলেন, "কিসের ক্ষমা লাবণ্য? আমি একদিনও একটুও তোমার ওপর রাগ করিনি। রাগ করলে ত ক্ষমা।" অতঃপর স্বামীস্ত্রীর দেড় বৎসরের সঞ্চিত অবরুদ্ধ সোহাগ মুক্ত হইয়া পড়িল। আবেগ একটু শান্ত হইলে লাবণ্য হাসিয়া বলিলেন, "সম্পাদক-শ্রেষ্ঠ, এরকম সম্পাদকত্ব আর কখনো কোরো না," এবং তাঁহার হাতে দুইখানি চিঠি দিলেন। একখানি খামে লাবণ্যের নাম ঠিকানা, মধ্যে বকুলফুল ও একটুকরা কাগজে ছাপ দেওয়া 'অগ্রাহ্য', অপর খামে পুণ্যপ্রভার নাম ঠিকানা, মধ্যে একটি কবিতা ও একখানা প্রেমপত্র। সম্পাদকের চক্ষু লজ্জায় কেমন হইয়া উঠিল। গম্ভীরপ্রকৃতি সম্পাদক আজ বালকের মতো হাসিয়াই ব্যাকুল। কিছুক্ষণ হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "লাবণ্য, সত্যই কি আমি এই বোকামিটা করেছিলাম? ভাগ্যে পুণ্যপ্রভার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল! পুণ্যপ্রভা আমার যে উপকার করেছেন, তাতে তাঁর কবিতা আর প্রত্যাখ্যান করতে পারব না।"

লেখকের বিপদ

আমি বনে জঙ্গলে, পর্ব্বত-কান্তারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অট্টালিকার অরণ্য কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি গবর্ণমেণ্টের স্কুলমাষ্টারী করিতাম, এবং সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া ও পুস্তক রচনা করিয়া কিঞ্চিৎ উপরি উপার্জ্জন করিতাম।

পটলডাঙ্গায় বাড়ীভাড়া করিলাম। অন্দরে রহিলেন মা, সদরে রহিলাম আমি; সদর অন্দর উভয়ত্র বিচরণ করিতেন আমার ভগ্নী। আমি অবিবাহিত। বয়স কিন্তু বৎসর পঁচিশ হইবে। আমার ভগ্নীর বয়স ষোল, সেও অবিবাহিতা, কারণ আমাদের রুচিটা সনাতন প্রথা মানিয়া চলিতে চাহে না।

আমার নাম বিরূপাক্ষ, ভগ্নীর নাম মোক্ষদা এবং আমাদের জন্মস্থান কামস্কাট্‌কা না হইলেও আমার জনকজননী যে কটমট নামের বিষম পক্ষপাতী তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

আমি মাষ্টারী করিতাম, মোক্ষদা বেথুন কলেজে পড়িতে যাইত, মা সারাটা দুপুর গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, বাসনওয়ালার ঢংঢঙানি ও ফেরিওয়ালার বিচিত্র স্বরালাপ দিব্য অগ্রাহ্য করিয়া ঘুমাইয়া কাটাইতেন। তিনটার সময় ঠিকা ঝি আসিয়া কড়া নাড়িয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিত। মা বলিতেন, 'বিরু, কলকেতায় কেন এলি, গোলমালে একটু ঘুমোবার জো নেই।' ঝি কিন্তু হাতের কব্জির ব্যথার জন্য একটা বালিশ চাহিয়া আমায় উদ্বাস্ত করিবার জোগাড় করিয়াছিল।

কলিকাতার কোলাহল, ঠিকা ঝিয়ের শাসন, গোয়ালার সজল দুগ্ধ, ধোবার অত্যাচার, সকল সামগ্রীর মহার্ঘতা প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবের মধ্যে বিশেষ একটি উপদ্রব জুটিয়াছিল, আমাদের প্রতিবেশী মহেন্দ্র বাবু। তিনি একটি ষোড়শী কন্যার পিতা হইয়া আমার চিরকৌমার্য্য ক্ষুণ্ণ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রবাবুর কন্যার নাম সুশীলা। তিনি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষিতা হইতেছিলেন এবং অনূঢ়া।

তাঁহাকে দেখিয়া আমার মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব নায়িকার রূপ বর্ণনার চিরাগত প্রথাটা আমার এ কাহিনী হইতে বাদ দিলে কাহারো ক্ষতি নাই।

শ্রাবণের অবিরামজলপাতক্লিন্ন পথে আগুল্‌ফ কর্দ্দমের মধ্য দিয়া যখন স্কুলে যাইতাম, তখন বেথুন কলেজের লম্বা গাড়ীর দ্বারপথে সুশীলার মুখখানি হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত; আর আমি, প্যাণ্টালুন হাঁটু পর্য্যন্ত কর্দ্দমাক্ত করিয়া ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মতো স্কুলে পৌঁছিতাম।

সারাদিনই অন্যমনস্ক থাকিতাম। কি পড়াইতে কি পড়াইতাম। ছাত্রেরা আমার উপর চটিয়া গেল, হেডমাষ্টার আমায় বদলি করিবার ভয় দেখাইলেন। আমি ভীত হইয়া আরো ঘাবড়াইয়া গেলাম।

সুশীলার সঙ্গে মোক্ষদার ভাব হইয়া গেছে। সুশীলা আমাদের বাড়ী আসে, মোক্ষদা রিটার্ণ-ভিজিট দেয়। কাজে কাজে আমিও মহেন্দ্র বাবুর পরিবারে পরিচিত হইয়া গেলাম। যত ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিলাম, ততই মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। ছুটির দিন সুশীলা বাড়ীর সেবিকা, পাচিকা, পরিচারিকা। কি তৎপরতা, কি পরিচ্ছন্নতা, কি কুশলতা! রাঁধিতে রাঁধিতে বাটনা বাটে, জল তুলে, পরিবেষণ করে, স্থানভ্রষ্ট দ্রব্যাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখে। অন্যদিন সে বিদ্যার্থিনী, হাস্যমুখরা, রহস্যপরা। তাহার নিপুণ হস্ত আমার অসংযত গৃহস্থালীকেও কেমন একটা শৃঙ্খলার সৌষ্ঠব ও শ্রী দান করিয়াছিল। তাহার নিপুণ সেবা পাইবার লোভে আমি আমার ঘরটিকে 'এলোমেলোর মেলা' করিয়া রাখিতাম। গল্প, রহস্য, বিদ্রূপে আমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াইয়া সুশীলা যখন চলিয়া যাইত, তখন দেখিতাম কেমন অলক্ষ্যে যাদুকরীর কনককরস্পর্শে শ্মশান উদ্যানশোভায় শ্রীশালী হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের যেমন নামটা কামস্কাটকার আমদানি, বুদ্ধিটাও তেমনি হনলুলুর আমদানি ছিল। স্বভাবটাও ছিল সাহারার মতো, তাতে না ছিল সরসতা, না ছিল বৈচিত্র্য। আকারটা কিন্তু প্রজ্ঞাসদৃশ ছিল না। আমার এই যে কাহিল অবস্থা, মোক্ষদা তাহার খোঁজই রাখে না।

অবস্থা যখন সঙ্কটাপন্ন,—স্নেহময়ী ভগিনী আমার তখন দিব্য নিশ্চিন্ত। কি করি, একদিন মোক্ষদাকে ডাকিলাম।

"মোক্ষদা, একটা ঘটকালী করতে পারবি ?"

মোক্ষদা। হ্যাঁ দাদা কার ?

আ পোড়ারমুখী, তোকে মিছাই কতকগুলা কেতাব পড়াইলাম, বুদ্ধি হইল না। যখন হয় নাই, এবং অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন তখন সুতরাং ভাঙিয়াই বলিতে হয়! ঢোক গিলিয়া বলিলাম, 'আমার।'

মো। না, দাদা, বল না কার ?

আমি। আ মর, বলছি ত', আমার স্বয়ং নিজের।

মোক্ষদা কিছু অবাক হইয়া গেল। হইবারই কথা। বেচারার কিছু দোষ নাই। সে থতমত খাইয়া শেষে বলিল, 'দাদা, তুমি যে কক্‌খনো বিয়ে কর্ব্বে না বলেছিলে, ব্রহ্মচারী হ'য়ে জ্ঞানানুশীলন কর্ব্বে ?'

আমার ভারি রাগ হইল; দাঁত মুখ খিচাইয়া বলিলাম, 'তোর কাছে হলপ নিয়ে বলেছিলাম, না ?' মোক্ষদা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

মাকে মুখ ভার করিয়া বলিল, 'দাদার বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়েছে, আমায় বলছে ঘটকালী করতে।'

মা ত' আর আপনাতে নাই। চন্দ্রদর্শনে সাগরের মতো উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একেবারে আমার কাছে আসিয়া হাজির। আমি তখন ছাই পাঁশ কি ভাবিতেছিলাম। মার পুত্রবধূ-মুখদর্শনের আশায় যে আনন্দ তাহা প্রথমত আমি বুঝিতে পারি নাই। মা আবার কি বিরক্ত করিতে আসিলেন, ভাবিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলাম। মা আমার বিরক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ রে বিনু, আমার কি এমন কপাল হবে, আমি বৌয়ের মুখ দেখে মরতে পারব ?'

আমি মার মুখে কাজের কথা ও এমন ভালো কথার অবতারণা শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'দেখ মা, বিবাহ সম্বন্ধটা দু'পক্ষের মতামতের ওপর নির্ভর করে; নতুবা এতদ্দণ্ডেই তোমার সাধ পূর্ণ করে আমিও ধন্য হতাম। তা যখন হবার নয়, তখন ঠিক বলতে পারছি না, তোমার সাধ তোমার জীবদ্দশায় মিটবে কি না।'

মা। কেন বাবা, কালই আমি চারজন ঘটকী লাগিয়ে এই ছেরাবণ মাসেই যাতে বিয়ে হয় তা' করব। এই কটা দিন ভগবান আমায় বাঁচিয়ে রাখবেনই।

আমি। মা, আমার বিয়ের সম্বন্ধ যে-সে ঘটকীর দ্বারা হতে পারবে না। মোক্ষদা যদি পারে।

ইতিমধ্যে মোক্ষদা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বোকা লোকগুলা প্রায়ই বড় সরল হয়। মোক্ষদার রাগ ভালো হইয়া গিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ দাদা, কোথায় ঘটকালী করতে হ'বে বল না।'

আমি বলিলাম, 'সে কথা তোর সঙ্গে নিরিবিলিতে হ'বে।'

মা চলিয়া গেলে বলিলাম, 'দেখ মোক্ষদা, সুশীলা যদি তোর বৌ-দিদি হয় ত' কেমন হয়?'

বোকা মেয়েটা একেবারে বিশবাঁও জলের তলে পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণে দম লইয়া বলিল, 'সুশীলাকে আমি কিন্তু বৌ-দিদি বলে ডাকতে পারব না।'

'আ মর বাঁদরী, তোর যা খুসি তাই বলে ডাকিস্; আমি জিজ্ঞাসা করছি, কি, তোর বৌ-দিদির পদটা সুশীলাকে অধিকার করতে দিতে তোর কোনো আপত্তি আছে কি?'

'তা আমার আবার কি আপত্তি?'

'তবে শোন। আমি সুশীলাকে বিয়ে করব, তুই তার ঘটকালী

করবি, অর্থাৎ কি না তাকে ভজিয়ে আমার পত্নীত্ব গ্রহণে তাকে স্বীকার করাবি। রাজি ত?'

'রাজি।'

'তবে ঘটকালী বিদ্যায় তোকে একটু তালিম করে দেবো, তুই যে বোকা!'

মোক্ষদা হয় ত' মনে মনে বলিল, 'তুমিও ত' আমারি দাদা!'

২

আমারি গৃহের এক প্রকোষ্ঠে সুশীলা ও মোক্ষদা বড় হাসিয়া হাসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। আমি অন্তরাল হইতে শুনিতেছিলাম।

মোক্ষদা বলিল, 'সুশী, তোর বাবা তোকে আর কতদিন পড়াবেন?'

'যতদিন না একটা গলগ্রহ জোটে।'

'স্বামী কি একটা গলগ্রহ?'

'হলে টের পাবি।'

'গলগ্রহ কে জোটাবেন, বাবা না তুই নিজে?'

'ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধীয়তে।'

'কি রকম বর তোর পছন্দ?'

'বিনা ওজরে আজ্ঞাকারী।'

'মরণ আর কি!'

একটা যে বিষম হাস্যতরঙ্গ উঠিল তাহাতে মোক্ষদা বেচারার মুখস্থ পাঠের খেই হারাইয়া গেল।

হাসি থামিলে মোক্ষদা একেবারে বলিয়া ফেলিল, 'তুই যদি আমার বৌ-দিদি হোস্ ত' বেশ হয়।'

সুশীলা অধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'কক্খনো না। ইতরতাপশতানি সহে চতুরানন, কিন্তু লেখকের স্ত্রী হওয়াটা শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।'

হায়, হায়, আমি কেন লেখকব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম!

মোক্ষদা বলিল, 'কেন, লেখকের স্ত্রী হওয়া ত' গৌরবের কথা।'

'অতবড় দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকের আর হতে পারে না।'

'কেন, লেখকের কি দোষ?'

'হাজার গণ্ডা। পদ্যের মিল খুঁজতে বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর আমাদের ভোগান্তি বাড়ে। কটা বলব। তাদের প্রধান দোষ তারা বড় অসভ্য।'

মোক্ষদা এবার রাগিল, বলিল, 'যারা নিজেদের আহৃত জ্ঞান দিয়ে পরকে সুসভ্য করে তারাই ত' অসভ্য!'

সুশীলা হাসিয়া বলিল, 'তোর দাদাকে অসভ্য বলেছি বলে রাগিসনে। আমি প্রমাণ করে' দিচ্ছি। কোনো অসভ্য দেশে গিয়ে সুসভ্য লোকের চোখে সর্ব্বাপেক্ষা কি বিসদৃশ ঠেকে?'

মোক্ষদা। নগ্নতা।

সুশীলা। অর্থাৎ কি না, private ও public [ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য] জীবনের মধ্যে যে ব্যবচ্ছেদ-রেখা তারই উচ্ছেদ। কেমন? কবি ও লেখকেরা আপনাদের অন্তঃপুরের অন্তরাল উদ্‌ঘাটন কর্‌তে কুকি গারো অপেক্ষা কি কম পটু? তারা অসভ্যদের মতোই বুঝতে পারে না, কতটুকু প্রকাশযোগ্য আর কতটুকু গোপনীয়। যেখানে লেখকের 'অরিজিনালিটি' দেখি সেখানেই দাম্পত্যের পবিত্র গূঢ় সম্বন্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কবিপ্রণয়িনীর মতো দুর্ভাগ্য কার? দশের কাছে অপদস্থ, উন্মুক্ত, আলোচিত! রমণীর যে শালীনতা, তাহার মর্য্যাদা কবি-লেখনী পদে পদে ছত্রে ছত্রে অগ্রাহ্য করে', উল্লঙ্ঘন করে', ছিন্নভিন্ন করে' দিয়ে যায়। স্ত্রীলোকের সব চেয়ে দুর্ভাগ্য যা', তা' আমি কক্‌খনো মাথায় তুলে নেবো না।

সুশীলার অধরটি বেলাপ্রান্তে সাগরতরঙ্গের মতো কেমন একটা দৃঢ়তায়

উল্‌টিয়া পড়িল। চোখের কোণে কেমন একটা কুটিল হাসি ধারালো ছুরীর মতো জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। ডাক্তারের ল্যান্সেটের মতো আমার বুকটা এদিক ওদিক চিরিয়া দিল। যা' হোক এই লম্বা লেকচারে থতমত খাইয়া মোক্ষদাটা বড় একটা বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলিয়া ফেলিল।

"দাদাকে বলব, তিনি শপথ করে লেখকবৃত্তি ছেড়ে দেবেন।"

"লেখকের শপথের কোনো মূল্য আছে ? শপথ করে আমায় বিয়ে করবে, তার পর আমার একটি চাহনি, একটু হাসি, একটি বিলাস-বিভঙ্গ, একটি সোহাগ-বচন তার কবিত্বের রুদ্ধ স্রোতকে শতমুখ করে' ছেড়ে দেবে; আর বুভুক্ষু মাসিক-পত্র সাগরের মতো বুক পেতে তা গ্রহণ করবে ; কত পাঠকের সমালোচনাতরণী দাঁড়ে হালে সেই স্রোত কেটে কেটে নেচে ফিরবে। লেখক আপনার প্রণয়িনীকে দশের সম্মুখে উলঙ্গ করে যশস্বী হবার চেষ্টা করে। এ জাতের চেয়ে অসভ্য মুর্খ কেউ আছে কি ?"

মোক্ষদার পড়ানো পাঠ আর অগ্রসর হইল না। সুশীলা বলিতে লাগিল, "আরো, তোমার দাদার আর এক দোষ আছে, তিনি সুন্দর, সুশ্রী। যে লোক আমাকে পেয়ে পদে পদে আপনাকে হীন মনে করে ধন্য জ্ঞান না করবে সে আমার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়। আমার যে স্বামী হবে সে আপনাকে আমার অপেক্ষা হীন মনে করবে, আর আমি সোহাগে যত্নে তাকে সম্রাটের সিংহাসন দিয়ে আপনাকে তার দাসী করব। এই ত' জয়! সে মনে করবে, আমি স্নেহ দিয়ে গর্ব্বিতাকে পদতলে এনেছি ; আমি মনে করব, আমি ভক্তি দিয়ে অক্ষমকে দেবতার আসনে বসিয়েছি।"

সুশীলা হাসিয়া মোক্ষদার মুখে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "আমার মতো গর্ব্বিতা দেখেছ কি ?"

মোক্ষদা বেচারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি ক্যাওড়া কাঠের তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িলাম। তক্তাপোষ আমার দেহভারে বিরক্ত হইয়া 'ক্যাঁচ' করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া সুশীলা উঠিয়া আমার ঘরে আসিয়া অতি সহজ ভাবে হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আমাদের conversationটা গল্পে কেমন করে সাজাবেন সেটা না হয় একটু পরে ভাববেন, কিন্তু এখন আপনি মূর্ত্তিমান আপনার নাম না হ'য়ে, অতিথির প্রতি একটু সদয়াক্ষ হোন।'

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। সুশীলা "Hopelessly fallen in love" বলিয়া হাসিয়া আমার কান্নাটাকে ভারি লঘু করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। হায় রমণী, পুরুষের প্রাণটা কি তোমাদের এতই তুচ্ছ খেলার সামগ্রী?

মোক্ষদা এতদিনে ব্যাপারটা বুঝিল। মোক্ষদাকে বারণ করিলাম, মাকে যেন কিছু না বলে।

অতঃপর অধ্যাপনা যেরূপ সুনিপুণ ভাবে করিতে লাগিলাম তাহাতে আমি ঢাকায় বদলি হইয়া গেলাম। মা বলিলেন, 'বিরূ, বিয়ের কি হলো?' আমি বলিলাম, 'মা, সারাটা জীবন পান্থনিবাসেই কাটল, বিয়ে করি কখন? পেন্‌শুন নিয়ে মরবার আগে একটা চেষ্টা দেখ্‌ব।' মরার নাম শুনিয়া মা 'ষাট ষাট' করিয়া উঠিলেন।

৩

আমাদের বাড়ী ঢাকা জেলারই এক পল্লীতে। মোক্ষদাকে কলিকাতায় বোর্ডিঙে রাখিয়া, মাকে বাড়ীতে রাখিয়া, গহনার নৌকায় কোনো মতে একটু স্থান করিয়া লইয়া আমি ঢাকা যাত্রা করিলাম। আমি বদলি হইয়া মস্তিষ্কটাকে ঠিক করিয়া লইবার জন্য একমাস ছুটি লইয়াছিলাম। এ যাত্রা সেই ছুটির অন্তে।

গহনার নৌকায় ভদ্রলোক ৪।৫ জন; আর বাকি চাষী মুসলমান

ও একটি মুসলমান স্ত্রীলোক। তাহার বয়স ৩৫ হইতে চল্লিশের মধ্যে। তাহার মতো কলহপটু স্ত্রীলোক আমি আর দেখি নাই। সে আগমনমাত্র আসর জমাইয়া লইল। ঐ মিন্সে তাহার দিকে কি ভঙ্গীতে তাকাইল, ঐ মাঝি তাহাকে দেখিয়া হাসিল, এই ছোঁড়া তাহার গা ঘেঁসিয়া বসিল, ইত্যাকার চীৎকারে সে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রথম প্রথম আমাদের বেশ মজা বোধ হইতেছিল। শেষে যখন, 'আমার কাছে এস না, আমাকে এক ধারে থাকতে দাও, সরে' যাও', বলিয়া বিষম আবদার আরম্ভ করিল, তখন সকলেই তাহার উপর চটিয়া গেল। কেবল আমার চিন্তাকাতর চিত্ত একটা মজা পাইয়া বেশ আরাম বোধ করিতেছিল।

আমাদের নৌকা ধলেশ্বরী বাহিয়া যাইতেছিল। যেখানে ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্র মিলিত হইয়া মেঘনা হইয়াছে সেখানকার জলবিস্তার কূলহীন দিগন্তহারা সমুদ্রের মতো। বড় আনন্দে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি, মাঝি বলিল, "মেঘ উঠ্যাছে, ঝড় হইবো।" চাহিয়া দেখিলাম আকাশের এক কোণে একটু ছোট্ট মেঘ বিশাল সাগরবক্ষে অতি ক্ষুদ্র শৈলশিখরের মতো তরণীর যমরূপে চাহিয়া রহিয়াছে। আরোহীরা চীৎকার করিল, 'নৌকা কিনারে ভিড়াও।' কিন্তু সেখানে কূল কোথায়? মিনিট পনর যাইতে না যাইতে একটা দমকা বাতাস নৌকাখানাকে যে বিষম একটা দোল দিয়া গেল, তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে অগ্রদূতের প্রতাপ এতাদৃশ হইলে স্বয়ং ঝড় মহাশয় কিরূপ প্রতাপশালী হইয়া আসিতেছেন। মাঝি বলিল "আগুন্যা ফাপরা" আসিতেছে।

কুড়ি মিনিট পার হইতে না হইতে বিষম ঝড় আরম্ভ হইল। নৌকা ঝড়ের মুখে প্রচণ্ডবেগে মাতালের মতো ছুটিয়া চলিল। এখন সেই মুখরা মুসলমান রমণীর আর্ত্তনাদ ও বিনয় ঝড়ের শব্দকে ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল। সে মাঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তুই আমার চাচা, আমার প্রাণ বাঁচা।' মাঝি এই বিপদেও ব্যঙ্গ করিতে ছাড়িল না। বলিল, 'এই কিছুক্ষণ

আগে আমি তোর দিকে কুদৃষ্টি করছিলাম, আর এখন আমি তোর চাচা হই কেমন করে ?'

নৌকা ছুটিয়া গিয়া এক চরের উপর গিয়া উঠিল। ভাটার সময়, তখনো সেখানে ৫।৬ আঙ্গুল জল। সেখানে নৌকা উঠিবা মাত্র মাঝিরা ঝড়ের গতির অনুকূলে কতকগুলি খোঁটা পুঁতিয়া মোটা মোটা কাছি দিয়া নৌকাখানা বাঁধিয়া ফেলিল। আমরা মাঝির আদেশ মতো সকলে নামিয়া এক একটা খোঁটা ধরিয়া থাকিলাম। যত ঝড়ের বেগে নৌকায় টান পড়ে খোঁটা তত পুঁতিয়া যায়। মাঝির এই dynamicsএর জ্ঞান দেখিয়া আমার আনন্দ হইল। আমাদের পুস্তকস্থা বিদ্যার অপেক্ষা মাঝির সফল জ্ঞানের গৌরব উপলব্ধি করিলাম।

ঝড় কমিতে লাগিল। তখন একে একে সকলের মুখ খুলিল। একজন বলিল 'এখানে বড় কুমীরের ভয়।' শ্রুতিমাত্র প্রত্যেকের মধ্যস্থলে থাকিবার ব্যাকুল চেষ্টা জাগ্রত হইয়া উঠিল। হায় রে ক্ষণস্থায়ী প্রাণ! আমি খোঁটা ধরিয়া সকলের ব্যাকুলতা দেখিতে লাগিলাম; আজ আমি সকলের চেয়ে কত উচ্চ, কত নিস্পৃহ! মুসলমান রমণীটির প্রতি বড় অত্যাচার হইতেছিল। তাহার সতত চেষ্টা সে মধ্যে যাইবে, আর সকলে সমবেত চেষ্টায় তাহাকে বাহির করিয়া দিতেছে। সে মিনতি করিতেছে; সকলে বলিতেছে, 'নৌকায় যে একপাশে থাকবার জন্যে বড় কাজিয়া করছিলে, তোমার গায়ে আমাদের গা লাগছিল, এখন তুমি আমাদের গায়ের উপর আসছ কেন? একপাশে থাক, একপাশে থাক।'

জোয়ার আসিয়াছে; জল দেখিতে দেখিতে আমাদের কোমর ছাড়াইয়া উঠিল। মাঝি সকলকে নৌকায় উঠিতে বলিয়া খোঁটা তুলিয়া ফেলিল। যত লোক উঠিয়া যাইতেছে, কুমীরের লক্ষ্য তত অব্যর্থ মনে করিয়া জলের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। আমি একপাশে

আমার শেষ পালার জন্য দাঁড়াইয়া ছিলাম। লোকের ব্যস্ততায় ও একটা দমকা বাতাসের ধাক্কায় নৌকাখানা ঘুরিয়া গিয়া আমায় আঘাত করিল, আমি জলে পড়িয়া গেলাম।

যখন জলের উপর ভাসিয়া উঠিতে পারিলাম, তখন দেখিলাম আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখান হইতে কোনো নৌকারই চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, নদীর জলের উপর অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে।

চারিদিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম। একজন লোক আমার দিকে সাঁতার দিয়া আসিতেছে। আমিও তাহার দিকে চলিলাম। লোকটি রমণী। ঠাহর করিয়া দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলাম 'সুশীলা!' সুশীলাও আমাকে চিনিল। সে কিছুমাত্র বিস্ময়ের ভাব না দেখাইয়া তাহার চিরসুন্দর রসিকতায় বলিল, 'বিরূপ বাবু, আজ ভগবান আপনি।'

আমি বলিলাম, 'সুশীলা, ভগবান আজ বিরূপ নন, বড়ই সদয়, একদিনের জন্যেও উভয়ের ভাগ্যফল একত্র গাঁথা হয়ে রইল।'

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, 'হতাশ প্রণয়ের বক্তৃতা দিবার স্থান ও কাল এ নয়, এটা কি ভুলে গেলেন?'

আমি তাহার বিদ্রূপ গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে লাগিলাম, 'তুমি আমার প্রাণভরা প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আজ মরণে আমাদের যে মিলন ঘটিয়ে দেবে, তার গ্রন্থি তোমার শত চেষ্টাতেও খুলবে না সুশীলা!'

সুশীলা বলিল, 'মৃত্যু কি আজ নিশ্চিত?'

'নিশ্চিত। চরের মুসলমানেরা সমস্ত দিন নৌকা নিয়ে বিপন্নকে উদ্ধার করে ফিরেছে, রাত্রের অন্ধকারে তারা আমাদের আর দেখতে পাবে না। কূল এখান হতে বহু দূরে; রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শ্রান্তিতে বা কুমীরের গ্রাসে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।'

সুশীলা দু'মিনিট চুপ করিয়া রহিল। জোয়ারের স্রোতে তর তর করিয়া ভাসিয়া চলিলাম। সুশীলা কহিল, 'তবে আপনার মাসিকের পৃষ্ঠায় লেখনী-কণ্ডূয়ন নিবারণের আর কোনই সম্ভাবনা নেই ?"

আমি বলিলাম, 'কিচ্ছু না'।

সুশীলা বলিল, 'তবে আজ আমি আপনাকে বিবাহ করতে রাজি।'

'রাজি সুশীলা রাজি' বলিয়া আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

সুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, 'হাত ধরলে বিবাহের আগেই যে সলিল-সমাধি হবে।'

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'সুশীলা, মরণকালেও কি লঘুতা বর্জ্জন করতে পার না ?'

সুশীলা হাসিয়া বলিল 'কেন করব ? মরণ যে-দেবতার স্নিগ্ধ কোল, তিনি কি গুরুমশায়ের মতো অনাবশ্যক ভয়ঙ্কর ? দেশী হাকিমের মতো অনাবশ্যক গম্ভীর ? হতাশ প্রেমিকের মতো অনাবশ্যক ম্রিয়মাণ ?' সুশীলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমি তাহার বিদ্রূপ রহস্য অগ্রাহ্য করিয়া কাতরভাবে বলিলাম, 'সুশীলা, বল বল, একটু সত্যের আভাস দিয়ে বল, তুমি আমায় বিয়ে করলে।'

'যিনি দিন রাত্রির কর্ত্তা, যিনি জীবন মরণের দেবতা, তাঁরই জাগ্রত চক্ষুর সামনে মিথ্যা বলি নাই।'

আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলাম, চাঁদ উঠিয়াছে। আমি সুশীলাকে বাহুবেষ্টনে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলাম। সুশীলা চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমার স্কন্ধে মস্তক রাখিল। দূরে হুলুধ্বনি শুনা গেল।

আমি চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। পায়ে মাটি ঠেকিয়াছে। ভাটা আরম্ভ হইয়াছে। আমরা একটা চরে ঠেকিয়াছি। দূরে শৃগালেরা

প্রহর ঘোষণা করিয়া গেল। আজ কৃষ্ণা দশমী, রাত্রি ১২টা। কি মহৎ গম্ভীর বিবাহ-বাসর!

৪

আমি কলিকাতায় সেই আগের স্কুলেই বদলি হইয়া আসিয়াছি এবং সে প্রায় দুই বৎসর। আমার আবার বদলি হইবার কথা হওয়ায় এবার হেডমাষ্টারের চেষ্টায়ই আমার কলিকাতার চাকরিই বজায় রহিয়াছে।

মা পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে মহাভারত শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইতেছেন। মোক্ষদা বেচারা ডেপুটীর গৃহিণী হইয়া সাত ঘাটের জল খাইয়া ফিরিতেছে। আর আমি খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে বসিয়া এই কাহিনী লিখিতেছি।

সুশীলা তার খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, 'কি হচ্চে?'

'তোমারই কাহিনী লিখছি।'

'তুমি আমায় বড় ঠকিয়েছ। তখন যদি লেখনীনিবারণী প্রতিজ্ঞাটা করিয়ে নিতাম!'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'গতস্য শোচনা নাস্তি।'

রহস্যে বিপদ

১

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন হরিশ অন্য স্কুল হইতে আসিয়া আমাদের ক্লাশে ভর্তি হয়। আমি বরাবর ইংরাজি স্কুলে পড়িয়াছি, আমার বয়স তখন সবে বারো; গুম্ফ শ্মশ্রুর রেখামাত্রও ছিল না; চেহারাখানাও

ঈশ্বরের বরে কোমল ও কমনীয় ছিল। অর্থাৎ যাত্রার দলে আমাকে মেয়ে সাজাইয়া দিলে বেমানান হইত না। হরিশ মাইনর পাশ করিয়া ষোল বৎসর বয়সেই একমুখ দাড়ীগোঁপ লইয়া আমাদের মধ্যে পরিচয় স্থাপন করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। হরিশ খুব বলিষ্ঠ, বড় লম্বা চৌড়া, জোয়ান। বড় বাচাল, বড় রহস্যপটু। আমি ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র এবং বড় লাজুক ও মিতভাষী।

হরিশ ৪।৫ দিনের মধ্যেই সকলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়া ফেলিল। আমারও মন সে আকর্ষণ করিল। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকটা মাস আমি তাহার কটু রহস্যগুলি পরিপাক করিয়া, পরীক্ষায় তাহাকে পরাস্ত করিলাম। আমি প্রথম ও সে দ্বিতীয় হইল। বোধ হয় আমার কার্য্যকরী মেধার নিকট পরাস্ত হইয়াই সে তাহার রহস্যের সকল বলটুকু লাজুক আমার প্রতি তীব্রতররূপে প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্তিতে জয়ের উল্লাস ভোগ করিতে লাগিল।

আমার নাম কুমুদিনীকান্ত। সে তাহা বিকৃত করিয়া করিল, 'কুমী'। আমার মিষ্ট কণ্ঠ বলিয়া আমি হইলাম 'বুলবুল'। ভালো পোষাক পরিচ্ছদ পরিলে আমি হইতাম 'হিরামন' বা 'লালমন'। তাহার ভয়ে শ্বেত পরিচ্ছদ পরিলেও হইতাম 'কাকাতুয়া'। আমি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতাম বলিয়া কোনও না কোনও পক্ষিপর্য্যায়ে পড়িতামই।

প্রথম প্রথম পক্ষীনামে আমার আপাদমস্তক লজ্জারুণ হইয়া উঠিত, হরিশের উপর বড় রাগ হইত। ক্রমশ এক রকম সহিয়া গেল। আরো, হরিশকে আমি বড় ভালো বাসিতাম; হরিশও তাহার সকল রহস্যের অন্তরাল হইতে স্নেহ দিয়া আমাকে বশ করিয়াছিল।

সমস্ত রহস্য দিয়া ক্রমাগত আক্রমণ করিয়াও দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা-তেও আমার প্রথম স্থান সে অধিকার করিতে পারিল না। সকল বিষয়ে আমি হরিশের নিকট পরাস্ত হইলেও এই জয়ে আমার সকল পরাজয়

বিস্মৃত হইতাম। ক্রমশ রহস্যগুলি পুরাতন হইয়া উগ্রতাহীন হইল, হরিশ নূতনের অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়ন আরম্ভ করিল।

আমি যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালোবাসিতাম, হরিশ তাহাকে বাবুয়ানি বলিয়া বিদ্রূপ করিত। কতক ইচ্ছায় (আমায় বিরক্ত করিবার জন্য) ও কতক স্বাভাবিক অশক্তিতে সে বড় এলোমেলো, বিশৃঙ্খলার মধ্যে থাকিত। তাহার বাসার চারিদিকে সমস্ত ছড়ানো থাকিত, ঘরে কাগজ বই ও ধুলা যেখানে সেখানে, মাটিতে বিছানায় সমভাবে ছড়ানো। আমি ইহাতে বড় বিরক্ত হইতাম।

তাহাতে হরিশ হাসিয়া বলিত, 'তোমার ঘর ত' যেন হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর দোকান, প্রকৃত গৃহস্থালী আমার ঘরে। সমস্ত সময়টা যদি জিনিষ গোছাতেই কাটে, জিনিষগুলাকে উপভোগ করি কখন ?'

আমি তাহার সহিত কথায় পারিতাম না। আমি তাহার গৃহসংস্কারে লাগিয়া যাইতাম। সমস্ত গুছাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতাম।

আমার উপদেশ যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল তাহা পর দিনেই বুঝিতে পারিতাম। আমি বড় চটিয়া যাইতাম।

হরিশ হাসিয়া বলিত, 'ঘরকন্না গোছানো স্ত্রীজাতির কাজ, তাহারা শৃঙ্খলা, পুরুষ উচ্ছৃঙ্খলা। আমি উদ্দামতা, তুমি শৃঙ্খলা। অতএব আমি পুরুষ, তুমি নারী।'

আমাকে কেহ স্ত্রীজাতির সহিত তুলনা করিলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাগ করিতাম। যদি একবার রাগ করিলাম, তবে হরিশের অদ্ভুত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত আমাকে সর্ব্বদা উত্যক্ত করিতে লাগিল। এক একবার মনে করিতাম হরিশের ঘর আর গুছাইব না। কিন্তু আমি হরিশকে ছাড়িয়া থাকিতেও পারিতাম না। হরিশের বাড়ী গিয়া তাহার ঘর গোছাইয়া না দিলে হরিশ বলিত, 'গিন্নি ঘরকন্না গুছিয়ে নেও, চল

বেড়াতে যাই।' কোনো দিকেই নিস্তার নাই দেখিয়া, আমি আমার গৃহিণীর পদ অগত্যা মানিয়া লইলাম।

গিন্নির পদ যদি মানিয়া লইলাম তখন হরিশ নূতন বিদ্রূপ আবিষ্কার করিয়া আমাকে 'হৃৎপিণ্ডেশ্বরী' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

হরিশের সংসর্গে আমিও একটু ইয়ার হইয়া উঠিয়াছিলাম। সে যেমন আমাকে ইয়ারকির ছলে 'হৃৎপিণ্ডেশ্বরী' বলিত, গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশের সময় পত্রে আমিও তাহার দেখাদেখি তাহাকে লিখিতাম, 'হৃৎপিণ্ডেশ্বর'।

উভয়েই এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম। অধিক মাত্রায় ইয়ারকি শিখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় কেহই বৃত্তি পাইলাম না। হরিশের অবস্থা ভালো ছিল না। তবু কষ্টেস্‌ষ্টে পড়িয়া এল্, এ, পাশ করিল। তার পর সে বর্ম্মায় অর্থের সন্ধানে গেল। আমি বি, এ, পড়িতে লাগিলাম। এতাবৎকাল আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই ছিল।

ছাড়াছাড়ি হইলে প্রেমের আবেগ ক্রমাগত জ্বালপ্রাপ্ত দুগ্ধের মতো প্রথমটা বড় ফোঁস ফোঁস করিয়া ফুলিয়া উঠে, ক্রমে কেমন জমাট কঠিন হইয়া, আর কোনো সাড়া দেয় না। প্রথম প্রথম আমাদের পত্রালাপ খুব চলিত, ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া আসিল। বহুকাল পরে আমি হরিশকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি আমরণ অনুতপ্ত ও লজ্জিত থাকিব।

২

হরিশ কলেজ ছাড়িয়া দিলেও অধ্যয়ন ছাড়ে নাই। স্কুল কলেজে থাকিতে সে বেশি পড়িত না; কিন্তু কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধ্যয়নস্পৃহা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সে কর্ম্মাবসরে কেবলই অধ্যয়ন করিত। স্বাধীন ও স্বেচ্ছামত অধ্যয়নে সে আমার কালেজীয় অধ্যয়নপদ্ধতি-

পাঠ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। যখন সে কর্ম্মে ও অধ্যয়নে নিতান্ত ব্যস্ত, তখন তাহার পিতা শিক্ষিত উপযুক্ত পুত্রের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া একটি দ্বাদশবর্ষীয়া খুকুমণির সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দেন। বোধোদয়-সমাপ্তজ্ঞানা অকালপক্কা বালিকা, যুবতীর লীলা অনুকরণ করিয়া জ্ঞানপিপাসু স্বামীকে আপন অধিকারে আনিতে সচেষ্ট হইত। হরিশের ইহা ভালো লাগিত না। মাতা হইতে সখী পর্য্যন্ত সকলের নিকট হইতে প্রণয়কলায় দীক্ষিতা বালিকার প্রৌঢ়ার মতো আচরণ হরিশের বড় বিসদৃশ লাগিত। সে যথাসাধ্য বালিকা স্ত্রীকে বালিকা রাখিয়াই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিত। কাজেই উভয় পক্ষেই একটা অসন্তুষ্টি জাগিয়া উঠিল। হরিশ অধ্যয়নে অনেক সময় নিযুক্ত থাকিত। এদিকে তাহার বালিকা পত্নীর অখণ্ড অবসর নানাবিধ অদ্ভুত কল্পনার আবাদ করিত।

এইরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গেল। আমি. বি. এল, পাশ করিয়া মজঃফরপুরে প্র্যাক্‌টিশ করিতেছি। হরিশ বদলি হইয়া হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। হরিশের চঞ্চল স্বভাব তাহার অধ্যয়নস্পৃহা ভেদ করিয়া বিকাশ পাইবার আর বড় অবসর পায় না। সে ক্রমশ গম্ভীর হইয়া পড়িতেছে। সংসারানভিজ্ঞা যুবতী-পত্নী ইহা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। হরিশ আপিস হইতে আটটা রাত্রে বাড়ী আসিয়া দেখিত, তাহার প্রত্যেক চিঠি তাহার সন্দিগ্ধা স্ত্রী খুলিয়াছে। তাহার চিঠি প্রায়ই ইংরাজি,—হরিশ শুধু হাসিত।

একদিন তাহার স্ত্রী বড় গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তুমি আমার চেয়ে যাদের বেশি ভালোবাস, তাদের নাম কি?'

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'কালিদাস—'

তাহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল, 'সে ত পুরুষ। মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি।'

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'তুমি বাধা দিলে কেমন করে' হবে। সব বলছি, শোন।"

তাহার স্ত্রী। বল। আর কে?

হরিশ। ভবভূতি—

তাহার স্ত্রী। আচ্ছা, ভব আর ভূতি কে? নামের ছিরি দেখ! তাদের চেহারা কেমন?

হরিশ। তাদের চেহারা কেমন, সে খোঁজ আমি রাখি না, তাদের মন বড় ভালো। তাদের কথা বড় মিষ্টি। তাদের সংসর্গ বড় সুখের।

হরিশের স্ত্রীর মুখখানা আরো অন্ধকার হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর?'

হরিশ। তারপর? বাণভট্ট, শ্রীহর্ষ, মাঘ—

হরিশের স্ত্রী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, 'থাক্। আমাকে যত ভালো বাস তা আমি জানি। অন্যের কথাই আমি জিজ্ঞাসা করছি। আরো আছে নাকি?'

হরিশ। ঢের আছে। শেক্সপীয়র, শেলী, গেটে।

তাহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিল 'এদের সঙ্গে তোমার কবে থেকে আলাপ?'

হরিশ। বর্ম্মা যাওয়ার পর।

তৎপত্নী। তাইতে নামগুলো অমন বিদ্‌ঘুটে। আচ্ছা, রোজ আপিস থেকে আসতে তোমার অত রাত্রি হয় কেন? রবিবার দুপুর বেলাই বা কোথায় যাও? সে কার বাড়ী? এঁ?

হরিশ হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, 'পাব্‌লিক লাইব্রেরীতে।'

হরিশের পত্নী। সে কি মেম নাকি? তার কাছে গিয়ে খুব সুখ পাও?

হরিশ। সে আর কি বলব? তোমার কাছে চুপ করে' থাকি, কিছু বলবার থাকে না বলে'; আর তার কাছে গিয়ে অবাক হ'য়ে থাকি, হৃদয়ের সকল কথা এক সঙ্গে সাড়া পেতে চায় বলে'। সে যখন তার হৃদয়ের এক একটি পৃষ্ঠা আমার সামনে খুলে দেয়, তখন আমি আত্মহারা হয়ে পড়ি।

হরিশের পত্নী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, 'তবে আমার কাছে আস কেন? আমি কালো কুৎসিত, লেখা পড়া জানিনে, আমায় তোমার কাজ কি?'

হরিশ। কাজ যে একেবারে না আছে তা' বলতে পারি নে। কিন্তু শুধু তোমার দ্বারা আত্মার ক্ষুধা মিটে না, তাই অন্যের সাহায্য ভিক্ষা করতে হয়। যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর উপাখ্যান ত' তোমায় কতবার শুনিয়েছি। তবু তুমি মৈত্রেয়ী হ'তে পারলে না।

তৎপত্নী। রেখে দেও তোমার মৈত্রেয়ী আর গার্গী; আমি অত শত বুঝি নে।

ক্রমশ চক্ষে অঞ্চল আরোপ; অবশেষে ফোঁসফোঁসানি।

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'চোখের জলে নাকের জলে মুখখানা বর্ষাকালের জিউলি গাছের মতো করে ফেললে যে! মেঝেটাও যে নাক ঝেড়ে ঝেড়ে গাছতলার মতো করে ফেললে।'

হরিশের গৃহিণী এ বিদ্রূপ সহ্য করিতে পারিল না। উচ্চ রবে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল।

ইহার কয়েকদিন পরে আমি হরিশকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখি—

মজঃফরপুর ১২।২।৯৩।

হৃৎপিণ্ডেশ্বর,

আমার পোড়াকপাল, তাই তোমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। দেখা ত' পাবারই জো নেই, চিঠি লেখাও বন্ধ করেছ। সেকালে তোমার কাছে বুলবুল, ময়না, হীরামন, লালমন, কাকাতুয়া কত কি আদরের

ডাক শুনতাম। এখন আমায় ভুলবেই ত'। তুমি বিবাহ করে' বোধ হয় সুখেস্বচ্ছন্দে আছ ; কিন্তু আমি আমার সতীন্‌কে অভগ্ন অধিকার দিতে রাজি নই। আমার অধিকার প্রথম। তাঁহার দাবী আমার পরে।

তোমার কুমুদিনী।

হরিশের প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাহার গৃহিণী যথারীতি এই পত্রখানির উপর রাহাজানি করিয়া, এতদিন পরে হরিশের অন্যপ্রসক্তির জাজ্বল্যমান প্রমাণ হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া একেবারে সপ্তমে সুর বাঁধিয়া হরিশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হরিশ রাত্রে বাড়ী আসিবামাত্র, তাহার গৃহিণী লাঙ্গুলমর্দ্দিতা সিংহিনীর মতো গর্জ্জন করিয়া বেচারা হরিশকে আক্রমণ করিল।

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'প্রিয়ে তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সংবরণ কর, আমি বড় ভীত হইতেছি।'

অশিক্ষিতা ক্রুদ্ধা রমণী এ শ্লেষ বুঝিল না। দ্বিগুণ তর্জ্জন করিয়া বলিল, 'তোমার বড় সোহাগের কুমুদিনী তোমার বিরহে ছটফট করছে যে। এত যদি, তবে আমার হাড় জ্বালাতে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন? এই নেও তোমার কুমুদিনীর চিঠি, মাদুলি করে গলায় পরো,' আর রোজ ধুয়ে একটু করে' জল খেও।'

চিঠিখানা ফট্‌ করিয়া বেচারার নাসিকায় প্রহত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। হরিশ চিঠি পড়িয়া কোনো মতে একটুখানি হাসির অবকাশে বলিল, 'এ কুমুদিনীকান্তের চিঠি। সে মজঃফরপুরের উকিল, পুরুষ মানুষ। ছেলেবেলা যখন একসঙ্গে পড়্‌তাম, তখন সে আমার 'হৃদপিণ্ডেশ্বরী গিন্নি কুমী' ছিল, এখন সে শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত মিত্র উকিলবাবু হয়ে পড়েছে। তাই এখন আমার হৃৎপিণ্ডটা তোমারই পাদপীঠ করে দিয়েছি। তুমিও তা দুই পায়ে থেৎলে খুব সদ্ব্যবহার করছ।'

সে কথা কেবা কানে তোলে? হরিশের স্ত্রী নিজের মনের ঝোঁকে

অনেক কথা বলিল; নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতামাতাকে যথেষ্ট গালি পাড়িল; কেননা তাঁহারা নাকি হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন।

হরিশ হাসিয়া বলিল, 'আমি যে একটা মস্ত দরিয়া, তা আমি জানতাম না। তোমার এই নূতন আবিষ্কারসংবাদ বিলাতে রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেবো।'

হরিশের স্ত্রী। আমায় বিলেতে পাঠিয়ে তোমার কি সুখ হবে? তোমার কুমী আছে, ভব আছে, ভূতি আছে, আরো কত বিধকুটে রূপসী আছে, তাদের বিলেতে পাঠিয়ে মেম সাজিয়ে পটের ছবি করে' বসিয়ে রেখো। আমি মার কাছে চলে যাব। পেটে স্থান দিয়েছিলেন হাঁড়িতেও স্থান দেবেন।

হরিশ বেচারা পরাস্ত মানিল। সেই রাত্রেই আমি এক টেলিগ্রাম পাইলাম, "Come by first train available, I am in great distress."

আমি সেই রাত্রেই দেড়টার গাড়ীতে রওনা হইয়া পরদিন সন্ধ্যার পর হরিশের বাড়ীতে উপস্থিত। হরিশ আমারই অপেক্ষায় দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ীর ভিতর হইতে আমাকে ও গাড়ীর ছাদ হইতে আমার বড় ব্যাগটা নামাইয়া হাসিতে হাসিতে সকল ব্যাপার বলিল। আমি বড় অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। হরিশ আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে গেল। হরিশ স্ত্রীকে বলিল, 'তোমার সতীন কুমুদিনী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে'। এই কথায় অপর পক্ষ হইতে যে গর্জ্জন শুনিলাম, তাহাতেই বুঝিলাম হরিশ বেচারার দিনগুলা নিরুপদ্রবে যায় না। হরিশের স্ত্রী বলিলেন, 'সে পোড়ারমুখীর এত সাহস যে আমি এ বাড়ীতে থাকতেই ঢুকেছে? কই সে? আমি তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।"

আমি হরিশের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আসিয়া বলিলাম 'ঠাকুরাণী, আমি পোড়ারমুখী নই, পোড়ারমুখো ; আপনার বিচারে য ঘা ঝাঁটা আমার প্রাপ্য, আমি তা গ্রহণ করতে রাজি আছি।'

ঠাকুরাণী স্ত্রীলোকের স্থলে পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। বলা উচিত, ভাগ্যে আমার অল্প অল্প দাড়িগোঁফ উঠিয়াছিল, নতুবা তাঁহার আমাকে পুরুষবেশী নারী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না।

কয়েক দিন ধরিয়া হরিশ, আমি ও আমাদের আরো কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া বহুত ওকালতি, বাক্যব্যয় করিলাম। তবুও হরিশের স্ত্রীর বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলাম না, যে, শ্রীমান কুমুদিনীকান্তই পোড়ারমুখী কুমী। আমার হাতের লেখা, সাক্ষীসাবুদ, Documentary ও Oral evidence কিছুই গ্রাহ্য হইল না। আমরা যত প্রমাণ প্রয়োগ করি, তিনি তত বলেন, 'হাঁ, তা ত' ঠিক্! আমি সব বুঝি! হ্যাঁ—এঁ—তবে ;—কিন্তু' ইত্যাদি।

এরকম 'তবে' 'কিন্তু'র নিকট আমরা পরাস্ত মানিলাম। হরিশের পত্নী বিশ্বাসঘাতক স্বামীর দূষিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। হরিশ জ্ঞানচর্চ্চা ও অর্থোপার্জ্জন করে, এবং আজকাল বেচারা আমার মতো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কালক্ষেপ করিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করে। আমার চিত্তের প্রসাদ কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হরিশ আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলে 'নিমিত্তমাত্র তুমি সব্যসাচী' ; কিন্তু আমার চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না। আমার রহস্যে হরিশের দাম্পত্যমিলনে যে চিরকালের বিয়োগ ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমার অন্তর অনুতপ্ত। যদি কখনো হরিশের সহিত তাহার স্ত্রীর আপোশ করিতে পারি, তবেই আমি শান্তি পাইব ; কিন্তু সে আশা বড় অল্প।

ভুল

সলিভান তাঁহার স্ত্রী নিনাকে লইয়া এক হোটেলের ত্রিতল কক্ষে বাস করিতেছিলেন।

একদিন রাত্রে সলিভান মাথার ব্যথায় বড় কাতর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আহ্বানে নিনা ঘুম ভাঙিয়া চোক কচ্‌লাইয়া উঠিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে?" সলিভান বলিলেন, "কপালের বাঁ দিকটা ভয়ানক টন্‌ টন্‌ করছে; অসহ্য যন্ত্রণা, ডাক্তার ডাক।" নিনা বলিলেন, "থাম, আমি ওষুধ দিচ্ছি।"

নিনা নামিয়া হোটেলের ভাণ্ডারঘরে গেলেন। একটুকরা কাগজের উপর খানিকটা রাইএর গুঁড়া গুলিয়া বেশ পুরু করিয়া একটা বেলেস্তারা তৈরি করিলেন।

ঘরে আসিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁহার স্বামী আলোটি বেশ কমাইয়া দিয়া, 'রাগ' খানি দিব্য গায়ে টানিয়া লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। নিনা সন্তর্পণে একটি চুম্বন দিয়া, আস্তে আস্তে বেলেস্তারার কাগজখানি কপালে বসাইয়া দিলেন।

নিনা থাকিয়া থাকিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছেন,—হঠাৎ তাঁহার স্বামীর বিকট চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। স্বামী কাগজখানা টানিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া নিনা যেমন বাধা দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলেন, তিনি অমনি ভীষণ বলে নিনার কব্জি চাপিয়া ধরিয়া "চোর, খুনে" বলিয়া বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এ চীৎকারে হোটেলের প্রায় সমস্ত লোক আলোকহস্তে তৎক্ষণাৎ সেখানে ছুটিয়া আসিল। নিনা ভয়চকিত দৃষ্টিতে জনতার প্রতি চাহিতেই দেখিলেন যে, ভীতিপাংশুলমুখে সলিভান ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর

হইতেছেন। যে নিনার হাত ধরিয়া আছে সে তবে কে? তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে ত' তাঁহার স্বামী নহে! নিনা বুঝিলেন তাঁহার ভুল হইয়াছে।

হোটেল বা ব্যারাকগুলির সকল তলই দেখিতে একরূপ; কক্ষ ও ঘরের আসবাবপত্র সমস্তই প্রায় এক রকমের। নিনা ঘুমভরা-চোখে দ্বিতলে উঠিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে ত্রিতলে উঠিয়াছেন; এবং ত্রিতলে তাঁহাদের যে নম্বরের ঘর দ্বিতলের সেই নম্বরের ঘরে সটান গিয়া এই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন।

যখন ভুল ব্যাখ্যাত হইয়া গেল, তখন লজ্জা-বিভোর নিনা বেলেস্তারাদগ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে ফিরিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আমি ভুলক্রমে আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি, ক্ষমা করিবেন।" সেই ভদ্রলোকটি কপালের জ্বালা গোপন করিয়া, কষ্টে হাসিয়া বলিলেন,"চোর বা খুনী মনে করিয়া আপনার সদয় সেবার পরিবর্ত্তে আমি রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি, আপনিও আমায় ক্ষমা করিবেন।" সলিভান হাসিয়া ভদ্রলোকটির করকম্পন করিয়া বলিলেন, "প্রকৃত খৃষ্টানের মতো পরের নিগ্রহ আপনি সহ্য করিয়াছেন। আপনার মহত্ত্বে আমি বেলেস্তারার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; অতএব, আসুন আজ হইতে আমরা বন্ধু হই।"

সেখানে হাস্যরহস্যের তুফান উঠিল। নিনা যে একটা চুম্বন বাজেখরচ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বস্থানকালের জাগ্রতপ্রহরী অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। কিন্তু কবি অন্তর্যামীর বাচাল গুপ্তমন্ত্রী, অজ্ঞাত কাহিনী বিজ্ঞাত করাই তাহার ব্যবসা!

রামধনের কীর্ত্তি

রামধন মণ্ডল বরিশালের কোনো ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করে। দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অজ্ঞাতনামা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দশটাকা জলপানী পাইল; এবং কলেজে পড়িতে বরিশালে গেল।

তাহার পিতা তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিত না। অগত্যা তাহাকে ছেলে পড়াইয়া আরো তিনটি টাকা উপার্জ্জন করিতে হইত। সুতরাং জলপানীর টাকাটা দানাপানিতেই ব্যয় করিতে হইত; জলপানী ব্যাপারটার জল্পনা দরিদ্রের মনে স্থান পাইত না।

ত্রিসংসারে তাহার বৃদ্ধপিতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। মৃত্যু যখন সেই একমাত্র আশ্রয়ও কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন বালক রামধন বড় কাতর হইয়াছিল। পুত্রকে রুদন্মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "বাবা রামধন, ঠিক আমার এই বিছানার নীচে তিনটা বোগ্‌নোভরা পাঁচহাজার টাকা আছে, তারাই তোমার সহায় ও আশ্রয় হবে, ভয় কি বাবা। তুমি যদি বুঝে সুঝে চল্‌তে পার, তোমার ভাবনা কি?"

রামধন মনে করিল, ইহা বিকারের প্রলাপ। সারাজীবন যে অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট পাইয়া জীর্ণ পর্ণকুটীরে লালিত হইয়াছে, সে একেবারে পাঁচহাজার টাকা প্রাপ্তির কথা প্রলাপ ও স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবেই ত।

তথাপি পিতার মৃত্যুর পর কৌতূহলবশে ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া দেখিল, তিনটি পিত্তলের হাঁড়ির মুখে লোহার তাওয়া ঢাকা রহিয়াছে। ঢাকা সরাইতেই বরদ সহস্রলোচন ইন্দ্রের মতো মুদ্রাগুলির সহিত রামধনের শুভদৃষ্টি হইল। প্রথমপ্রণয়প্রসঙ্গভীতা নবোঢ়ার মতো রামধনের অন্তরটা দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

রামধন স্থির করিল, এই টাকা লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া ভালো করিয়া লেখা পড়া করিবে।

যথা চিন্তা, তথা কাজ। বরিশালের কলেজ হইতে ট্রান্সফার লইয়া একেবারে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং হিন্দু হোষ্টেলের ত্রিতলে একা একটি ঘর লইয়া বাসস্থাপন করিল।

রামধন অতি অল্পকালের মধ্যে মহাধনবান বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল। সে কলেজের ব্যায়ামবিভাগের চাঁদা দিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিত এবং ব্যায়ামান্তে পেস্তা কিশমিশ, বাদাম আখরোট, চালগুজা সরভাজা পেট ভরিয়া খাইত এবং সঙ্গীদিগকে খাওয়াইত। কারণ ব্যায়ামান্তে পুষ্টিকর খাদ্যাহার শাস্ত্রের ব্যবস্থা!

অহোরাত্রে পাঁচবার চা খাওয়ার জন্য হোষ্টেলময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মৌতাতের সময় প্রসাদপ্রার্থী অনেক বন্ধু জুটিত। বনমালী জলখাবার জোগাইয়া উঠিতে পারিত না; ব্রজঠাকুর চপ কটলেট ভাজিতে ভাজিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিত; রজনী বেচারার সোডা লেমনেড জোগাইতে দশবার তেতলা উঠানামা করিতে পায়ে বাত ধরিয়া গেল। ভজহরির কুল্পিবরফ এবং বাথগেটের পাইন-এপল্ পানীয় না হইলে রামধনের সান্ধ্য মজলিস ভালো জমিত না। প্রত্যহ চার পয়সার মাখনের পাতামোড়া ঠোঙা ঝুলাইয়া ভোজনাগারে যাইত এবং আপনার পার্শ্ব ও সম্মুখবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কিয়দংশ বিতরণ করিয়া দিত। এইরূপে রামধনের প্রসার ও খ্যাতি খুব জমিয়া উঠিল।

রামধনের বিশেষত্ব সকল দিকে। হেয়ারকাটার চুল ছাঁটিত; লেড্‌ল কোম্পানি শার্ট জোগাইত; নৃত্য ধোপা তিন দিন অন্তর কাপড় কাচিত; এবং দন্তমঞ্জন হইতে সাবান এসেন্স পর্য্যন্ত রামধনের চেরিব্লশমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইত।

রামধন যখন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিত তখন বামহস্তের দিব্য

ইস্ত্রিকরা চকচকে শার্টের কফের উপর বেলফুলের কুণ্ডলিত মালা মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ বিতরণ করিত। শনি রবিবারে থিয়েটার কামাই যাইত না; এবং বিলাসিনীদিগকে পুষ্পার্ঘ্য দিতে সে মুক্তহস্ত ছিল। ম্যাকবেথ অভিনয় দেখিতে কাহাকেও পুষ্পার্ঘ্য দিবার অবসর না পাইয়া (লেডি-ম্যাকবেথকে উপহার দিতে তাহার বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই) বিকৃতদর্শন ডাইনী পিশাচীদের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দর্শকদের রূঢ়হাস্যাহত হইয়া বেচারা বড় ব্যথা পাইয়াছিল; কিন্তু সে বুঝিয়াছিল "তোমরা সবাই ভালো, কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো।"

রামধন হোষ্টেলে আসার পর অনেককে মনিব্যাগের বন্ধন বড় একটা খুলিতে হইত না। কিন্তু রামধনের ব্যাগ অনাসক্ত নিত্যমুক্ত হইয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেছিল। এবং বনমালী, ব্রজ, রজনী ও ভজহরির ট্যাঁক যে পরিমাণে ভারি হইতেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে শ্রীমান রামধনের ব্যাগ লঘু হইতেছিল।

রামধন দেখিল যে তৎপঠিত রসায়ন শাস্ত্রে টাকার উবায়ু সংজ্ঞা না থাকিলেও, টাকা নিতান্ত উবায়ু। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে পঞ্চসহস্রের মধ্যে পঞ্চশত মুদ্রা রাহল কি না সন্দেহ। তখন রামধন ধার লইতে আরম্ভ করিল। বাজারে তাহার নাম ডাক যথেষ্ট। প্রথম প্রথম বেশ ধার মিলিতে লাগিল।

কলেজের বেতন, হোষ্টেলের খাই খরচ, পরীক্ষার ফি প্রভৃতি অবশ্য নগদদেয় বিষয়ে খরচ করিতে করিতে অবশিষ্ট অর্থও শীঘ্র নিঃশেষের অভিমুখী হইল।

তখন বনমালী, ব্রজ, রজনী, ভজহরি, নৃত্য প্রভৃতি পাওনাদারেরা তাগাদা আরম্ভ করিল। তাগাদা প্রথমে অনুরোধ, তৎপরে অনুযোগ, অবশেষে আস্ফালনে পরিণত হইল। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের নিকট

হইতে কিছু কিছু হাওলাত লইয়া খাওনাদারদের থামাইল। কিন্তু অবশেষে বন্ধুদের নিকটও ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইল।

চারিদিকে শাণিত-তাগাদা-শরবর্ষী চতুর্দ্দশ রথীতে আক্রান্ত হইয়া বেচারা রামধন একদা রাত্রে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেসনে এবং সেখানে প্রথম চলিষ্ণু ট্রেন ডায়মণ্ড-হারবারের দেখিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া তাহাতেই সওয়ার হইয়া একেবারে ডায়মণ্ড-হারবার গিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা পুলিশের ভয়ে এবং কি এক অজ্ঞাত সঙ্কোচে লোকালয়ে যাইতে পারিল না। গ্রামের বাহিরে এক বনের মধ্যে একটা অতি উচ্চ দেবদারুর ঘনকুঞ্চিত পত্রান্তরালে লুকাইয়া রহিল; সমস্ত দিন অনাহারে ভয়ে ভয়ে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখিল এক বৃদ্ধ গলায় টুঁটি-আঁটা মালা পরিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ ডেডলেটার-আপিশ-ফেরত চিঠির মতো নানাবিধ ছাপে ভরিয়া, সেই গাছের তলায় উপস্থিত হইল। ভীত ভীত ভাবে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু রামধনের সৌভাগ্যক্রমে উপরে চাহিল না। চারিদিক জনহীন দেখিয়া বৃদ্ধ বস্ত্রান্তরাল হইতে একটা কাপড়-মোড়া পুলিন্দা বাহির করিয়া ভূমিতে রাখিল, তারপর সেই দেবদারু বৃক্ষটার পাদদেশে একটা ছোট শাণিত খোন্তা দিয়া ত্রস্তহস্তে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই পুলিন্দাটা প্রোথিত করিল এবং গর্ত্তটিকে বেশ করিয়া ভরিয়া দিয়া তাহার উপর একটা আশশেওড়ার গাছ রোপণ করিল এবং সেই গাছের আশ-পাশে ঘাসের চাপড়া বসাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্থানটিকে যথাসম্ভব নিঃসন্দেহ করিল। তৎপরে পাছে তাহার নিজের স্থান ভুল হইয়া গোলমাল উপস্থিত হয় বলিয়া সেই স্থানটাকে চিহ্নিত করিবার জন্য খোন্তার কোণ দিয়া দেবদারু-গাত্রে ত্বক্‌ কাটিয়া লিখিল 'ইহ'।

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিল। রামধন বৃক্ষচূড় হইতে যখন দেখিল যে বৃদ্ধ বহুদূরে চলিয়া গেল, তখন সে বৃক্ষাবরোহণ করিয়া

দেবদারুর একটা শাখা ভগ্ন করিয়া তৎসাহায্যেই সেই গর্ত্তের উপরকার আলগা মাটি খুঁড়িয়া বৃদ্ধপ্রোথিত পুলিন্দাটি বাহির করিয়া লইল। এবং পকেট হইতে রজর্সের চকচকে একখানা ছুরি বাহির করিয়া সেই পুলিন্দা-জড়ানো মোমজমা কাপড়ের সেলাই কাটিয়া ফেলিল। কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইল একটা টিনের চোঙ। টিনের চোঙের ঢাকনি খুলিয়া বাহির হইল একটা লম্বা মোটা বাঁশের চোঙা। চোঙার ভিতরে দেখা গেল কতকগুলি করেন্সি নোট। সেগুলি দেখিয়া রামধন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল ; নিমজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয় লাভের মতো সে সেই চোঙাটিকে দ্বিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিল। আশা আশ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। রামধনের অদৃষ্টে গুপ্তধন প্রাপ্তিযোগ যথেষ্টই ছিল।

রামধন নোটগুলিকে সজ্জিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চোঙার মধ্যে গুপ্ত করিল, এবং ছুরি দিয়া বৃক্ষগাত্রে বৃদ্ধের লেখার সঙ্গে ত্বক কাটিয়া লিখিল—

'ইহ্ গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,
নিল এই ঋণ
শোধ্য পেলে দিন'।

তৎপরে রামধন গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিল এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই তিলকমালাধারী বৃদ্ধের পরিচয় জানিয়া লইল।

বৃদ্ধের নাম জগন্নাথ, জাতিতে স্বর্ণবণিক, ধর্ম্মে পরম বৈষ্ণব। সে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু দুই দুর্বৃত্ত অনাচারী মদ্যপ পুত্রের অসাবধান ব্যয়ে বৃদ্ধের অবস্থায় ভাঁটা লাগিয়াছে, ইত্যাদি।

রামধন বুঝিল পুত্রের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই ধনগুপ্তি।

রামধন পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বৃদ্ধের বাড়ী গেল এবং বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া, তাহার করুণকাহিনী শুনিয়া, বহু সমবেদনা ও আশ্বাস দিয়া, বৃদ্ধকে পরম আপ্যায়িত করিয়া আসিল।

রামধন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে হোষ্টেলে গিয়া উপস্থিত। তাহার পলায়নে হোষ্টেলময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে হোষ্টেল সন্ধ্যা-কালের কাকসমাকুল বটবৃক্ষের মতো, লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মতো মুখর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ আসিয়া 'হ্যাণ্ড্‌শেক' করিল, কেহ পিঠে চাপড় কষিল, কেহ নমস্কার করিল, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শ্রীমান্ রামধন তাহার চিরায়ত্ত হাস্যে সকলকে প্রীত-আপ্যায়িত করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিল যে পাওনাদারদের নালিশ অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাদি হোষ্টেলের আপিস ঘরে লইয়া রাখা হইয়াছে, এবং অদ্য বেলিফ আসিয়া প্রকাশ্য নিলামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা ঋণানুপাতে সকল পাওনাদার-দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া রামধন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বর্ণ চসমার স্বচ্ছ অন্তরালে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "ফোঃ স্ক্রাউণ্ড্রেল্‌স্! ফাই আন্‌গ্রেট্‌ফুল্ ব্রুট্‌স্! তারা আমাকে এত ছোটলোক মনে করে?"

কেহ কেহ তাহাকে 'এড্‌ভাইস্ গ্রাটিস্' দিল যে, পাওনাদারেরা যে রকম চটিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে সহজে তুষ্ট করা যাইবে না। অতএব কোন 'ডেঞ্জার্ ব্রেভ' না করিয়া তাহার 'গা ঢাকা' দেওয়াই ভালো।

রামধন হাসিয়া তাহার সদ্যোদ্গত গুম্ফে একটা পাক দিয়া প্রভুত্বের ভাবে বলিল, "মেক্ ইওরসেল্‌ভস্ ঈজি, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড্‌স্, আই অ্যাম্

কোয়াইট্ এ ম্যাচ্ ফর্ দেম্।"" তারপরে চোঙার মধ্য হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচন বন্ধুদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া রামধন বলিল, "ডোণ্ট্ ইয়ু থিঙ্ক্ আই য়্যাম্ ওয়েল্ ইকুইপ্‌ট্।"

তখন 'হিপ্ হিপ্ হুরে' এবং 'থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ রামধন বাবু' শব্দে (তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রচলিত হয় নাই) হোষ্টেল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

রামধন তাহার বিস্মিত জিজ্ঞাসু বন্ধুদিগকে বুঝাইল যে তাহার অলস কর্ম্মবিমুখ পাজি নায়েবটা জমিদারী হইতে ঠিক সময়ে টাকা পাঠায় নাই বলিয়াই ত' এত অনর্থ। সে নিজে গিয়া তাহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিয়া এই টাকা লইয়া আসিয়াছে। ইত্যাদি।

রামধন সেইদিন সমস্ত পাওনাদারদের সতিরস্কার দেনা দিল। বন্ধুগণ দেখিয়া আনন্দিত হইল যে, 'রামধন বাবু অনারেবলী অ্যাকুইটেড্।'

রামধন বন্ধুবর্গকে পরিতোষ করিয়া ভোজ দিল। সে দিন ভজহরি পঁচিশ টাকার রোজবেরি-রসগোল্লার কুলপি বরফ বিক্রয় করিয়াছিল।

রামধন এক্ষণে ঠেকিয়া শিখিয়া বিশেষ মিতব্যয়ী ও সংযমী হইল। সে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এফ, এ, কোনো গতিকে পাশ করিল। কিন্তু তদনন্তর বিশেষ মেধাবী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাহার নূতনতর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। সে এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের উকিল বিশ্বম্ভর বিশ্বাসের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল এবং শ্বশুরের আশ্রয়চ্ছায়ে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল।

রামধন বিবাহলব্ধ ও শ্বশুরদত্ত টাকা বাঁধিয়া একদিন ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ডায়মণ্ড হারবারে গিয়া বুড়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বুড়া ত' কাঁদিয়াই আকুল। তাহার হরিনামের

ঝুলি রামধনের মাথায় বার বার ঠেকাইয়া কত রকম শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ করিল।

ক্ষণেক পরে কিঞ্চিৎ সংবৃত হইয়া বলিতে লাগিল—

"আমার গুণধর ছেলেরা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ও নষ্ট করছিল বলে বৃদ্ধবয়সের অভাবের দিনের জন্যে আমি সেই পাঁচ হাজার টাকা সেই দেবদারুর তলায় লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম। তখন আমার থলি শূন্য দেখে এক ছেলে অন্যত্র চুরি করে' জেলে গেল; এবং অপরজন মদ খেয়ে একজন স্ত্রীলোককে খুন করে' দ্বীপান্তরে গেছে। অন্য ছেলেটাও যদি দেশছাড়া হয়ে দ্বীপান্তরে যেত ত' আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। যা হোক তবু কথঞ্চিত নিশ্চিন্ত হয়ে অর্থের সন্ধানে গিয়ে দেখলাম সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ গলায় চাদর বেঁধে সেই দেবদারুরই ডালে ঝুলে সকল দুশ্চিন্তা, সমস্ত যন্ত্রণার অবসান করতাম; কেবল তোমার লেখা—

'ইহ গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,
নিল এই ঋণ,
শোধ্য পেলে দিন'।

আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়ে অকাল অপমৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। এই শ্লোকের 'ঋণ' ও 'শোধ্য' এই দুটি কথা দুই বন্ধুর মতো আমার দুই কানে ক্রমাগত আশা ভরসা, সান্ত্বনা আশ্বাস দিতে লাগল। সেই দুটি কথার পরামর্শ মতো আমি অপেক্ষা করে আছি; এবং দারিদ্র্য-অনশন-ঋণে বিবিধ কষ্টভোগ করেও অজ্ঞাত ঋণীর নিরন্তর শুভকামনা ও সুমতি প্রার্থনা করেছি। বাপধন, তুমি আমারই ঐকান্তিক প্রার্থনাতে এত বড়, এত সুশীল হয়েছ। যদি আশ্বাস দিয়ে না যেতে, তবে বৃদ্ধের মনস্তাপে পলে পলে দগ্ধ হয়ে তুমি অধঃপাতে যেতে, এ কথা নিশ্চয়।"

রামধন হাসিয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিয়া সুদসমতে ঋণ শোধ করিল। তখন বৃদ্ধ জগন্নাথ রামধনকে উকিল জানিয়া তাহা দ্বারা এক উইল প্রস্তুত করাইল।

সমস্ত অর্থ গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ৺শ্যামসুন্দরের দৈনিক সেবার ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে। পুত্রদ্বয় গৃহপ্রত্যাগত হইলে পৈতৃক গৃহে বাস-অধিকার পাইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইবে মাত্র। সম্পত্তির ট্রাষ্টি ও একজিকিটার নিযুক্ত হইলেন অন্য দুই জনের সহিত হাইকোর্টের সুশীল ধর্ম্মাত্মা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামধন মণ্ডল।

কব্‌রে আশক্‌

সূক্ষ্মস্রোতা সরবৎ নদী তুর্কিস্থানের মরুপ্রান্তরে সরবৎ সদৃশ স্বাদু নীরধারা ঢালিয়া দিয়া সাগরে গিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে। সরবৎ নদীর সিকতাময় পুলিন বেষ্টন করিয়া উত্তরে আথলাৎ গিরিমালা। গিরিসানুতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খর্জ্জুরবীথি। দক্ষিণকূলে শুধু সিকতার সীমাহীন বিস্তার, মাঝে মাঝে পেস্তা, চালগুজা প্রভৃতির ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা। আথলাতের কোলে আদানা গ্রাম; আথলাতের শীর্ষ-বিস্রুত 'সন্না' নির্ঝরিণী আদানার বুক চিরিয়া নহর বহিয়া সরবৎ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। আদানা যেন বাঘাম্বর গঙ্গামৌলী মহেশের মতো গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মনোরম।

আমির আম্মন এই প্রদেশের অধিপতি। আদানায় তাঁহার পল্লীভবন। তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর; ক্রূর আরব মরুর মধ্যে মধুচরিত্র শ্যামদ্বীপ। দিব্য গৌর, উন্নত, পেশীপুষ্ট দেহ; পুষ্পপ্রফুল্ল কোমল মুখশ্রী; অংসবিলম্বী দীর্ঘ কুঞ্চিত বাবরি চুল; পরিচ্ছদ সহজ সুন্দর; দৃঢ়চরিত্র, নিষ্ঠাবান।

গুল্‌সুরৎ তাঁহার একমাত্র বেগম। গুল্‌সুরৎ বাস্তবিকই "গুল-সুরৎ"। তাঁহার স্বামীর আদরের ডাক "গুল্‌-গুলাব"। বাস্তবিক সে গোলাপ ফুলের মতোই সুন্দর ;—গোলাপের লালিমা তাহার ওষ্ঠে ও গণ্ডে ; গোলাপের কোমলতা তাহার দেহ ও মনে ; গোলাপের গন্ধ তাহার চরিত্র ও ব্যবহারে ; গোলাপের কণ্টক কুর্দ্দিস্থানের ঈর্ষাকাতর সুন্দরীদের চিত্তে।

গুল্‌সুরৎ স্বামীতে নির্ভরশীলা, তাহারই উদ্যানের স্বহস্তবর্দ্ধিত শ্যামা-লতাটির মতো ; সকলের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণা কপোতীর মতো ; অজ্ঞাত-প্রচ্ছন্নগুণা কস্তুরী মৃগের মতো ; প্রকট চিত্তসৌন্দর্য্যে গুপ্তদেহশ্রী কাঁঠালী চাঁপার মতো। সে প্রজ্ঞাবান চরিত্রবলী স্বামী পাইয়া গর্ব্বিতা নহে, ধন্যা ; স্বামী তাঁহার মতো ফুলটি পাইয়া মুগ্ধ।

আদানা হইতে প্রায় এক ক্রোশ তফাতে গুল্‌সুরতের এক ভগ্নীর বাড়ী। তাহার নাম নুরনেহার। নুরনেহার গুল্‌সুরতের ভগ্নী অপেক্ষা সখীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। সূর্য্যের স্বর্ণ আভা সরার উচ্ছল জলে যখন সান্ধ্য-লালিমা দান করিত, যখন আখরোট বাদামের ফুলের গন্ধে আদানা মত্ত হইয়া উঠিত, যখন বুলবুল 'দেওয়ানা' হইয়া পড়িত, তখন গুল্‌সুরৎ ঔৎসুক্য-ক্ষুব্ধ চিত্তে ভবন-জালায়ন মুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিত, কখন তাহার বহিন নুরনেহার কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের উপর দূর প্রান্তরে দেখা দিবে। ফিরোজা রঙের রেশমী বোরকা ভেদ করিয়া উৎসুক সখীর চঞ্চল দৃষ্টি গুল্‌সুরৎ মনশ্চক্ষে অনুভব করিত ; আপনার স্বাগতদৃষ্টি বহিনের প্রতি প্রেরণ করিত ; উষ্ট্র হেলিয়া দুলিয়া দ্রুত চলিত।

একদিন বৈকালে আমির আম্মন ভোজন-ভবনে বৈকালিক আহারের জন্য আসিয়াছেন। ঘরটি 'কম্‌খাব' আচ্ছাদিত ; তাহার উপর গজ-দন্ত-নির্ম্মিত মেজের উপর মখমলের আস্তরণ ; তাহার পার্শ্বে স্বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র কারুচিত্রিত কেদারা, তদুপরি আমির আম্মন উপবিষ্ট। ঘরের চারিদিকে বড় বড় জানালা, জানালার উপর সূক্ষ্ম মসলিনের 'পরদা', জানালাগুলিকে

অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে; প্রতি বাতায়নাবকাশে একজন বাঁদি দণ্ডায়মানা; নীল পেশোয়াজ, সবুজ ওড়না, লম্বিত বেণী, মেহদি-রঞ্জিত হস্ত, কজ্জললিপ্ত চক্ষু; সুন্দরীদের বিচিত্র বসনে বৈকালিক রৌদ্র ঝিকিমিকি খেলিতেছে; দক্ষিণ বায়ু ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাতায়নের আচ্ছাদনী ঠেলিয়া, ঘরে ঢুকিয়া যুবতীর ওড়না উড়াইতেছে, আতরের গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। বাঁদির হাতে থাঞ্চাভরা মিষ্টান্ন, কাহারো হাতে রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ মেওয়া, কাহারো হাতে সরবৎ, কাহারো হাতে গোলাপপাশ, কাহারো হাতে আতরদান, কাহারো হাতে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন। গুল্‌সুরৎ স্বামীকে আহার্য্য বিতরণ করিতেছে। তাহার 'আসমানি' রঙের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের ওড়না, স্বর্ণখচিত জরির জুতা, মস্তকের লম্বিত বেণী বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা, চোখের কোণে 'সুরমা' টানা, হাতের তলে জাফরাণের রং, গণ্ডে ওষ্ঠে অনিন্দ্য স্বাস্থ্যের লালিমা; বৈকালের রৌদ্র যখন তাহার দেহ-চুম্বনের অবকাশ পাইতেছিল তখনই হাসিয়া উঠিয়া চক্ষে ঝিলিক হানিতেছিল, গুল্‌সুরতের গণ্ডের লালিমা গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। গুল্‌সুরতের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে স্বামীকে আহার করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু আমির আম্মনের কৌতূহলী চক্ষু সে শোভায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। গুল্‌সুরৎ গোলাপের সরবৎ, মেওয়া ও মিষ্টান্ন একে একে স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছিল, স্বামীর ভোজনশেষ পাত্র উঠাইয়া বাঁদিদের হাতে দিতেছিল।

যখন আহার আরম্ভ হইল, তখন গুল্‌সুরৎ ওড়নাখানি গুটাইয়া লইয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং গজদন্তমণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছের 'সন্দলী' পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। আম্মন প্রেয়সীর সরবৎ-মধুর স্নিগ্ধ রূপ-ধারায় অভুক্ত, গোলাপী সরবৎ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। তিনি প্রিয়ার কিশলয়কোমল মসৃণ সুন্দর ছোট্ট হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের আসার সময় হইয়াছে?"

গুলসুরৎ বলিল, "না, এখনো আসার সময় হয় নি। ঐ দেয়ালের রৌদ্রচিহ্ন যখন ঐখানে উঠিবে, তখন হেনা ফুটিবে, বুলবুল ডাকিবে, আমার বহিনের উট পেস্তার ক্ষেতে দেখা দিবে।"

আম্মন প্রেয়সীর বর্ণনাবহুল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের এখানে আর না আসাই ভালো; হয় তাহার আগমন বন্ধ করিতে হইবে, নয় তো আমাদের আদানা ছাড়িতে হইবে।"

গুলসুরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার প্রিয়সখী ও বহিনের প্রকৃতি মধুর; সে তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিল?"

আম্মন কতকগুলি পেস্তা ও কিসমিস একত্র করিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, "তোমার বহিন আমার সঙ্গে 'আশক' করিতে উৎসুক।"

এই কথাতে গুলসুরৎ বসোরার গোলাপ-ক্ষেতকে লজ্জা দিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "বহিনের স্বামীর প্রতি 'আসনাই' হওয়া ত স্বাভাবিক। যে আমাকে ভালোবাসে, তাহাকে তোমাকে ভালবাসিতে মানা কর না কি? আম্মন আবজোসের বীচি ফেলিয়া বলিল, "না, তা বারণ করি না, কিন্তু বেশি ভালবাসিয়া ফেলিলেই বিলক্ষণ ভয় হয়, কারণ তোমার স্বামী একটি বই ত নয়।"

এই কথাতে গুলসুরৎ "যাও" বলিয়া স্বামীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া একটি ছোটরকম ধাক্কা দিল; আম্মনের অঙ্গুলিধৃত আঙুরটি মাটিতে পড়িয়া অভিমানে ফাটিয়া গেল।

দু'জনের হাসিকে বাধা দিয়া নুরনেহার বলিয়া উঠিল, "তোমাদের আনন্দের 'শরিক' আসিয়াছে।"

গুলসুরৎ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া ভগ্নীর হাত ধরিল।

* * * * *

পরদিন প্রাতে আম্মন একখানি পত্র স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কথা সত্য কি না।" গুলসুরৎ পড়িতে লাগিল :—

"হে আমার জান-বেহেস্তের ইঞ্জিল, গুল্‌সুরতের কাছে শুনিলাম যে আমার গোপনপূজা হৃদয়-দেবতার গোচর হইয়াছে। ভালোই। জানাইবার জন্য আমার প্রাণ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সরলা গুল্‌সুরৎ মনে করে আমি তাহারই প্রেমের আকর্ষণে উটে চড়িয়া, তপ্ত বালুকার প্রান্তর ভাঙিয়া নিত্য আদানায় যাই! কিন্তু খামিন্, তুমি জানিয়াছ, নুরনেহারের চক্ষুর 'নুর' তুমি। এবং আমার নাম অন্বর্থ হইয়াছে শুধু তোমাকে দেখিয়াই। কে আমার এই গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিল? বুঝি মনোভব। আজ আমার প্রেম বসন্তের প্রজাপতির মতো বিচিত্রবর্ণের রঙিন্ পাখা মেলিয়া উড়িয়াছে, আয়্ ইয়ার, তাহাকে তোমার চিত্তপুষ্পের প্রেমমধু পান করিতে দেও। আমি বিধবা, কিন্তু তুমি আমার ভগ্নীপতি হইলে কেন? জানি আমি, বহিন গুল্‌সুরৎ তোমার স্ত্রী থাকিতে তুমি আমায় 'নেকাহ্' করিতে পার না। কিন্তু, তবু—তোমার প্রেম না পাইলে আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি গুল্‌সুরতের প্রেমে 'মশগুল,' কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে এমন প্রাণপ্লাবী প্রেম কোথায়? আমার মতো রূপ সে কোথায় পাইবে? সে কি আমার বাঁদি হইবার যোগ্য? যদি দয়া হয়, তোমার বাগানে বৈকালে আমায় দেখা দিয়ো, আমার অনেক কথা বলিবার আছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমায় যদি সেখানে না পাই তবে বুঝিব আদানায় আমার কবরেরও স্থান হইবে না। একটি ত্বদর্পিতপ্রাণা রমণীর শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে জানিয়ো। ফকত।

অভাগিনী নুরনেহার।

পত্র পড়িতে পড়িতে গুল্‌সুরতের গণ্ড বাহিয়া ধারা বহিল, যেন বসোরার গোলাপ-ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ হইতেছে। জলভরা চোখ দুটি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া গুল্‌সুরৎ বলিল, "খামিন্, কি হবে? নুরনেহার আমার বহিন না হইলে তোমায় সাদি করিতে বলিতাম।

আমায় 'তালাক' দিলে বিবাহ হয়, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব! তুমি ও নুরনেহার আমার যে তুল্য প্রিয়।"

আম্মন বলিলেন, "প্রেয়সি, একনিষ্ঠতাই হজরৎ মহম্মদের অনুমোদিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? যে আপন দোষে দুঃখকে ডাকিয়া আনিয়া আপনার চিত্তদুর্গ অধিকার করিতে দেয়, তাহার দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট বা শোক করা বৃথা। খোদা বহিনকে শুভমতি দান করুন।"

* * * * *

আম্মনের ভবন-সন্নিহিত উদ্যানের বাদামতলায় অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছে। আখরোটের গাছে আঙুরের লতা বেড়িয়া উঠিয়াছে, একটা বুলবুল লতার শাখায় ঝুলিয়া একটা আঙুরে এক একবার চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আর এক একবার মুখ উঁচু করিয়া সুধাসিক্ত কণ্ঠে মধুর শিশ দিয়া উঠিতেছে। পুষ্পবহুল বসন্তে হেনা, বকুল, চামেলি ও গোলাপের গন্ধে সান্ধ্যসমীরণ ভারাক্রান্ত হইয়া মৃদু বহিতেছে। উদ্যানের মধ্যে পাষাণ-বেদিকা বিদীর্ণ করিয়া সরার জল ফোয়ারা হইয়া রূপার তারগুলির মতো জলধারা তমসাচ্ছন্ন শূন্যে প্রেরণ করিতেছে; সে জল নীচে পড়িয়া, নহর বহিয়া, সরবৎ নদীতে গিয়া মিশিতেছে। সরার বুকে সান্ধ্যসূর্য্যের শেষ স্বর্ণাভা নিভিয়া গেল। আম্মন ও গুল্‌সুরৎ ভবন-জালায়ন হইতে অস্পষ্ট দেখিলেন, পুষ্পবিতানের মধ্য হইতে বাহির হইল নুরনেহার; আজ তাহার বোরকা নাই, গুণ্ঠন নাই; ফিরোজা রঙের পেশোয়াজ, গোলাপী ওড়না, পৃষ্ঠে দোদুল্যা বেণী;—দীপ্ত সৌন্দর্য্য উদ্যানে যেন দাবাগ্নি জ্বালিয়াছে।

নুরনেহার একবার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া লইল। প্রাসাদের দিকে চাহিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তার পর কাঁচি দিয়া বেণী কাটিয়া ফেলিল, চোখের সুরমা মুছিয়া ফেলিল, হাতের কুসুমরাগ নহরের জলে ধুইয়া ফেলিল, ওড়না পেশোয়াজ ফেলিয়া মোটা

বোরকায় গুণ্ঠন টানিল। তারপর—পরিত্যক্ত প্রসাধন একত্র করিয়া রাখিল। তার পর—দক্ষিণমুখে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তার পর—ধীরে ধীরে খর্জ্জুরবীথির অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

আম্মন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নুরনেহার গৃহে ফিরিল না, বোধ হয় মক্কায় কাবাতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে গেল।" এতক্ষণ গুল্‌সুরৎ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, এখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিষাদিত দম্পতি একটি "শামাদান" হাতে লইয়া বাগানের উদ্দেশে বাহির হইলেন।

আম্মন পরিত্যক্ত পোষাকের উপর একখানি কাগজ দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া "শামা"র আলোতে পড়িলেন, নুরনেহারের প্রার্থনা :—

"এই আদানায় আমার সকল গর্ব্ব, সকল মোহ, সকল পাপের কবর হউক। রে সয়তান, আমাকে আর প্রলুব্ধ করিও না। হে পরমেশ্বর, মানুষের প্রেম আকর্ষণে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার প্রেম লাভেও যেন বঞ্চিত না হই। আমার চিত্ত, হে সোভান্ আল্লা, তোমার প্রেমে পবিত্র হউক।"

আম্মন সে লিপিখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমেন"। বিষাদিত দম্পতি মক্কার দিকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গুল্‌সুরৎ বহিনের কর্ত্তিত বেণী ও পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ একটি অশ্রুসিক্ত স্বর্ণপেটিকায় সযত্নে রাখিয়া দিল। তাহার উপরে মিনার কাজে লিখিত হইল "কবরে আশক"।

প্রেমের নিরিখ

১

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গমক্ষেত্রে মহেন্দ্রবিদার নগরে রাজা দ্রৌণায়ণ রাজত্ব করিতেন। দ্রৌণায়ণ রাজ্যকামুকতার জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গের ভীতি ও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়াছিলেন।

গজেন্দ্রগড়ের রাজা মল্লশূরই কেবল তাঁহাকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অকালে মল্লশূরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বালকপুত্র পুষ্পহাসের রাজমন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

দ্রৌণায়ণ আপনাকে অপহত-কণ্টক মনে করিয়া পরম উল্লসিত হইলেন; এবং গজেন্দ্রগড় রাজপরিবারের অশৌচান্ত না হইতেই মহারাজ মল্লশূরের এযাবৎবাহুবলরক্ষিত রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ প্রভুরাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্য দ্রৌণায়ণকে বাধা প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে দ্রৌণায়ণের প্রধান সহায় এবং সহচর ছিলেন তাঁহার পুত্র ভদ্রমুখ এবং কন্যা ভদ্রসোমা।

ঝল্লকণ্ঠ যখন সমরাঙ্গনে নিশিত বাণ ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন পুষ্পধন্বার তির্য্যককৃত ধনু ভদ্রসোমার কুঞ্চিত ভ্রূতল হইতে দুই চারিটি খরকটাক্ষবাণ ছুটিয়া আসিয়া ঝল্লকণ্ঠের হৃদয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়া গেল।

দৈনিক সমরাবসানে যখন ঝল্লকণ্ঠ আপন শিবিরে সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে "তদ্বিষ্ণুর পরমপদ"-স্থলে ভদ্রসোমার ব্রীড়াবীর্য্যব্যঞ্জিত ফুল্ল মুখকমল বারংবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কাতর হইয়া ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন—

"হে মা ভবানী, একি হইল মা? চিরশত্রুতাসম্বন্ধিতজনের সহিত

এ প্রীতিসম্বন্ধস্থাপনলালসা মনে কেন উদয় হইল? যাহাকে দিগ্ধশরবিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার চরণনিম্নে আপনার হৃদয় পাতিয়া দিতে সাধ হইতেছে কেন? যাহার হৃদয়রক্তে কর্ত্তব্যের তর্পণ করিতে হইবে, তাহারই চরণতল আমারই হৃদয়রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে বাসনা হইতেছে। হে মদনদহনশম্ভু, আমায় বল দেও, এই চিত্তবিক্ষোভ প্রশান্ত কর—"

উপাসনা শেষ হয় নাই, দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল—বিপক্ষশিবির হইতে জনৈক দূত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহার উপাসনা শেষ হইল না। কি এক অব্যক্ত কারণে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুষ্পধন্বা কত মধুময় আশার কথা কানে গুঞ্জরণ করিতে লাগিল। প্রবল বাসনাঝঞ্ঝা ক্ষীণ সংযমচেষ্টাকে কোথায় উড়াইয়া দিল। তিনি দূতকে প্রবেশের আজ্ঞা দিলেন।

দূত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। কম্পিত হস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

"স্বস্তি শ্রী সমরবিজয়শ্রীঅভিনন্দিত গজেন্দ্রপুরাধীশ্বরসচিবশ্রেষ্ঠ-ঝল্লকণ্ঠ-শ্রীকরকমলোপায়ন-পত্রিকা—

"সমরকুশলী বীরশ্রেষ্ঠ, আবাল্য যে আদর্শীকৃত বীরমূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহা আজ আপনাতে শরীরী দেখিলাম। শত্রুকন্যার পূজোপচার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। নিবেদন ইতি—রাজকন্যা ভদ্রসোমা।"

ঝল্লকণ্ঠ হর্ষাতিবেগস্তম্ভিত-হৃদয়ে লিপিখানি বারংবার পড়িতে লাগিলেন। আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না, আপনার অনুভূতিকে প্রত্যয় হয় না। 'একি সত্য? একি সত্যই সত্য? উপহাস নহে, বিদ্রূপ নহে, ব্যঙ্গ নহে,—প্রকৃত সত্য? পিপাসাক্ষামকণ্ঠ পক্ষী জল চাহিতেই ধারাপ্রবাহ মুখে আসিয়া পড়িল? আজ আমি প্রকৃত জয়ী—রমণীর চিত্তজয় শতসাম্রাজ্য জয়ের তুল্য! আমি ধন্য, আমি জয়ী!'

রাজকন্যা ভদ্রসোমাকে উত্তর লিখিলেন—

"মন্মথমৈত্রীবশীকৃতা রাজকুমারীভদ্রসোমা-শ্রীকরকমলোপন্থতা-পত্রিকা—

"ভদ্রে, আপনি মন্মথের পুষ্পধনুর সম্মোহন শর! আজ আমি জিত কি জয়ী ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার আনন্দ যেন আমার নিত্যোপভোগ্য হয়। নিবেদন ইতি—মুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ।"

পরদিন মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। রাজা দ্রোণায়ণ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের সহিত কন্যা ভদ্রসোমার উদ্বাহ অঙ্গীকার করিলেন, এবং মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ বাধাপ্রদানের ভাণমাত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্রগড় রাজ্যের বহুলাংশ দ্রোণায়ণকে অধিকার করিতে দিবেন, এইরূপ গুপ্ত অঙ্গীকার স্বীকার করিলেন। কামোপহতচেতা ঝল্লকণ্ঠ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন।

২

নীরা ও ভীমা নদীর সঙ্গমসম্মুখে রাজকুমারীর পুষ্পবাটিকা। নীলাঞ্জনদ্যুতি ক্রীড়াশৈলের প্রত্যন্তদেশে সুরম্য কদলীকুঞ্জ, তন্মধ্যে মর্ম্মরশিলাপট্ট বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পুষ্পতরুর পদতলবাহিতা ক্ষীণা নির্ঝরিণীর রজতসূত্রধারা নীরার নির্ম্মল ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। শয়নীয়-স্নিগ্ধশিলাপট্ট-সমাসন্না ভদ্রসোমা ভূষণশিঞ্জিত হস্ততালে তাঁহার প্রিয় ময়ূরটিকে নাচাইতেছিলেন; আর তাঁহার সখী পুষ্পিলা অশোক-পলাশের মালা গাঁথিয়া তাঁহার শিরোমুকুট গড়িয়া দিতেছিল। অশোক-পলাশের রক্তস্তবক শুভ্রললাটে পড়িয়া দেবকন্যা উষার ললাটতিলক অরুণের মতো শোভা পাইতেছিল। শ্রুতি-আশ্রিত মুক্তাগুচ্ছে সেই পুষ্পলালিমা প্রতিফলিত হইয়া শ্রুতিমূলে বিচিত্র পত্রলেখা রচনা করিতেছিল। গুঞ্জনমধুপপুঞ্জ কেলিকুঞ্জে ব্রততীবলয়াসঞ্জনা কুরুবকশাখা হইতে কপোতবধূর করুণধ্বনি কি এক তরল বিষাদ বর্ষণ করিতেছিল। সহসা মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কপোতবধূ উড়িয়া গেল; করকিশলয়তালমুগ্ধ নর্ত্ত্যমান ময়ূর সংবৃতনৃত্য হইয়া উড়িয়া গিয়া বকুলবৃক্ষে বসিল; সখি পুষ্পিলা সরিয়া দাঁড়াইল; রাজকন্যা ময়ূরকণ্ঠী বসনখানি অঙ্গে টানিয়া দিয়া, চলিত দুকূলের সূক্ষ্মসুবাসে কদলীবিতান পূর্ণ করিয়া, অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখভাবে লজ্জাসম্ভ্রমের রেখামাত্র অঙ্কিত হয় নাই, বুঝি বিরক্তিমিশ্রা ঘৃণার ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হইয়াছিল। তবু ভাবমুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ সেই লীলাচতুরার তদবস্থ ভাব দেখিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভদ্রসোমা আপনাকে উন্নত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, এ পুরন্ধ্রীর কেলিকুঞ্জ! রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে।"

ঝল্লকণ্ঠ হাসিয়া দুইপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ছলকোপনে, আমাকে আসিবার অধিকার দিয়াছ, তাই আসিয়াছি। প্রেমময়ি, আবেগাতিশয্যহেতু যদি আচারের অতিক্রম করিয়া থাকি, অনুগত জনকে ক্ষমা কর, আমি তোমারই।" সস্বেদপুলককম্পিতাঙ্গ মন্ত্রী দুইপদ সরিয়া ভদ্রসোমার হস্তধারণের উপক্রম করিলেন।

রাজকন্যা পুচ্ছবিমর্দ্দিতা সর্পিনীর মতো গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,"মন্ত্রিন, পুরন্ধ্রীর অমর্য্যাদা করিবেন না।"

ঝল্লকণ্ঠের বীরহৃদয়ও এই তর্জ্জনে সঙ্কুচিত, কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া এই ধৃষ্টতা করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সত্যরক্ষা করিয়া আমাকে আপনার প্রেমের অধিকার প্রদান করুন।"

ভদ্রসোমা পূর্ব্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, বীরত্ববিমুগ্ধচিত্তার শ্রদ্ধা যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমায় ক্ষমা করিবেন; আমি সম্পূর্ণ আপনার অযোগ্যা,—যুদ্ধাস্ত্র-প্রশান্তবুদ্ধিতে ইহা এখন আমি

বুঝিতেছি। আমি আপনার ধৃষ্টতা যেমন মার্জ্জনা করিলাম, আপনিও আমার প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

বাক্‌হত ঝল্লকণ্ঠ একবার সেই লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের দিকে চাহিলেন; সেখানে অটলতা শাণিত খড়্গের মতো উদ্যত দীপ্ত রহিয়াছে, সেখানে করুণাশ্রদ্ধার লেশ মাত্র নাই। ঝল্লকণ্ঠ ধীরে ধীরে কদলীকাননের মধুর-শীতল ছায়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিরহতপ্ত হৃদয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল তপ্ত পথে চলিয়া গেলেন।

ঝল্লকণ্ঠ চলিয়া গেলে ভদ্রসোমা পুষ্পমুকুট ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; মনোজ্ঞকুর্পাসকপীড়িতস্তনা খেদবতী আপনার কঞ্চুলিকা ছিন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে ঝল্লকণ্ঠের প্রথম প্রণয়দূতীকল্পা লিপিখানি বাহির করিয়া, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে শিলাপট্টের উপর পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"এস এস ওহে দয়িত, তোমার অপমানক্ষত অশ্রুপ্রলিপ্ত করিয়া দিব; এস ওগো এস দেবতা, প্রেমশ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে তোমার পূজা করিব; তোমার পূর্ণ গৌরবে এস গরবী, আমার হৃদয়মন্দিরে, তোমার গৌরব-কণিকা স্খলিত হইতে আমি দিব না; এস ওহে এস মনোহর, ও হে সৌম্য, আমার যৌবনবসন্তের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে দিব; কোথা যাও, ও গো ফিরে চাও, ওহে দুরন্ত অভিমানী, অবহেলাহত অশ্রুকুম্ভ ভাঙিয়া গিয়াছে,—রুদ্ধ কর হে সক্ষম, সে প্রবাহ রুদ্ধ কর; কোথা যাও ও গো ফিরে চাও, ওহে তেজস্বী, আমার অন্তরে আগুন লাগাইয়াছ, স্নিগ্ধ কর, ওহে সন্তাপহর, অন্তর শীতল কর; ওহে প্রাণেশ্বর তুমি ফিরে এস, ওগো ফিরে এস।

অয়ি কঠোর, যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিমযশো ননু ঘোরমতঃপরম্‌।

কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে ॥"

রাজকন্যার বিলাপে ব্যথিতচিত্তা সখী পুষ্পিলা দৌড়িয়া গিয়া হৃদয়ভারে মন্থরগতি ঝল্লকণ্ঠকে ধরিয়া বলিল, "মন্ত্রিবর, রাজকন্যা আপনার জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি আসুন, ওগো সত্বর আসুন।"

ঝল্লকণ্ঠ শশাঙ্কদর্শনোচ্ছ্বসিতহৃদয় সাগরের মতো উল্লাসবিদ্রুতগতিতে কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, বিলুণ্ঠনবিশ্লথবেশা ভদ্রসোমা করুণক্রন্দনে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন।

ভাববিহ্বল প্রীতিপ্রফুল্ল ঝল্লকণ্ঠ স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রেয়সি, আমি আসিয়াছি, ওগো দেখ, আমি প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করিয়া চরণোপান্তে আসিয়াছি—উঠ হৃদয়েশ্বরি, উঠ"।

বাক্‌কশাহতা কোপস্ফুরিতাধরা রাজকন্যা ত্বরিত উঠিয়া সংবৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন ওগো, এখানে কেন? যাও যাও তুমি চলিয়া যাও। অপমানের উপর অত্যাচার সংযোগ করিয়ো না। যাও তুমি লৌকিকাচার-চঞ্চুর, চলিয়া যাও। এখানে ওগো মন্ত্রী, তোমার কোনো কাজ নাই, কোনো কর্ত্তব্য নাই।"

বিস্মিত অবাক ঝল্লকণ্ঠ পুনরায় নিঃশব্দে বাহির হইয়া রমণীচিত্তের জটিল রহস্য জল্পনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সখী পুষ্পিলা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভদ্রসোমা আবার শিলাপট্টের উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"এলে যদি, তবে যাও কেন, ওহে চিরবাঞ্ছিত,—তুমি আপনার পূর্ণ-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার চিত্তক্ষেত্রে খেলা কর। ওহে দুর্লভ, তোমায় পাইয়া আবার হারাই কেন? ওগো বল্লভ, অশিথিলপরিরম্ভে আমাকে গ্রহণ কর।"

৩

প্রত্যাখ্যাত ঝল্লকণ্ঠ পত্র লিখিলেন ঃ—

"ভদ্রে, অজ্ঞান-অনিচ্ছা-কৃত যদি কোনো পাপ করিয়া থাকি, যথেষ্ট শাস্তিভোগ করিয়াছি,—ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর। ইতি—ত্বদর্পিতপ্রাণ ঝল্লকণ্ঠ।"

দূত রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল—রাজকুমারী পত্রোত্তর দেন নাই।

রাজকুমার ভদ্রমুখ ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "ভগ্নী সোমা, প্রণয়বিহ্বল সন্ধিমিত্র সচিব ঝল্লকণ্ঠকে কেন নিগৃহীত করিতেছ? তোমার লালসালুলিত ঝল্লকণ্ঠ তোমার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য পাত্র।"

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তিনি আমার যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে আমি তাঁহার যোগ্যা নহি। তাঁহাকে আমার অনবস্থিত প্রগল্‌ভতা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন।"

ব্যর্থদৌত্য রাজকুমার ফিরিয়া গেলেন।

ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া ভদ্রসোমার বাহ্যতকঠোরপ্রতীত প্রতীপগামী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল—

"ওগো প্রেম যদি আসে, তবে যোগ্যতা লইয়া আসে না কেন? মন্মথমথিতমন যাকে চায়, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না কেন? দোষ গুণ বিচারের প্রবৃত্তি আসে কেন? জগৎটা এই বিরাট 'কেন'-সূত্রে প্রতিচ্ছন্ন,—ইহার মীমাংসা হইল না, বুঝি হইবে না।"

রাজা দ্রোণায়ণ স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে বলিলেন, "বৎসে সোমা, সহসা একি বাতুলতা? ঝল্লকণ্ঠ তোমার পরিবর্ত্তে আমাকে বিশাল রাজ্যের অধিকার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বারংবার ব্যর্থীকৃত সর্ব্বপ্রচেষ্টা অনায়াসে সফল হইতেছিল, তুমি একি অনর্থপাত অকস্মাৎ আনয়ন করিলে? বালচাপল্য ত্যাগ কর; ঝল্লকণ্ঠকে বিবাহ করিতে স্থিরমতি

হও; তোমার বালসুলভ নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি হস্তগত বিশালরাজ্য ত্যাগ করিতে পারি না; তোমায় ঝল্লকণ্ঠকে বরণ করিতেই হইবে।"

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পিতা, রাজশাসন চিত্তদমন করিতে নিতান্ত অক্ষম। কন্যার চিত্ত বিক্রয় করিয়া রাজ্য অধিকার না হয় নাই করিলেন।"

পিতা বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভদ্রসোমা কাঁদিয়া উঠিল—"হায় হায়, চিত্ত যদি রাজশাসনেও দম্য হইত! আমার এ বিদ্রোহী চিত্তকে দমন করিতে কি প্রকৃষ্ট বাহুশক্তি বর্ত্তমান নাই? ওগো কে বলিয়া দিবে, প্রেম ও কর্ত্তব্যের জীবনান্তক যুদ্ধ কিসে বিরামলাভ করিবে;—বিজয়লক্ষ্মী একপক্ষ অভিনন্দিত করুক, আমার চিত্ত শান্ত হোক। বিষম ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জলধিতরঙ্গের মতো বিপরীত ভাবশ্রেণী আমার হৃদয়-বেলায় নিরাশ্রয়ভাবে আছাড়িয়া দুধারি ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওগো বিধাতা, শান্ত কর, ওহে শান্তি দেও। প্রগ্রহে অশ্বের মতো সবলে হৃদয়কে টানিতেছি; জানি না তাহাতে কতগুলি তন্তু ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া যাইতেছে।"

৪

মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ অনায়ত্তীকৃত প্রভুরাজ্য দ্রোণায়ণ রাজার নিকট ফেরত চাহিলেন। রাজ্যলোলুপ দ্রোণায়ণ প্রথমত যেন শুনিলেন না; তার পর যেন ভালো বুঝিলেন না; তারপর ইতস্তত করিলেন; তার পর বলিলেন, "আমার কন্যাসম্প্রদান করিতে তো প্রস্তুতই আছি, আপনি তাহাকে সম্মত করুন।" বারংবার বিফলপ্রযত্ন নিরাশ্বাস ঝল্লকণ্ঠ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া চাহিলেন।

তখন দ্রোণায়ণ বলিলেন, "স্বায়ত্তীকৃত রাজ্য কোন্ নির্ব্বোধ ত্যাগ করে। আমি উহা ত্যাগ করিব না।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "সামর্থ্য থাকে ফিরাইয়া লইব।"

দ্রৌণায়ণ বলিলেন, "সেই ভালো।"

ঝল্লকণ্ঠ বৈরনিশ্চিন্ত হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

৫

অপমানোদ্বেজিত ব্যর্থপ্রণয়লালস ঝল্লকণ্ঠ উদ্বোধিতোগ্রশৌর্য্যসাহায্যে উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজা দ্রৌণায়ণের কঠিন কবল হইতে সমস্ত নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিলেন। উদ্ধারব্রতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ স্বসঞ্চিত অর্থ হইতে দিয়া প্রায়শ্চিত্তশুচি তপঃকৃশ যাজ্ঞিকের মতো দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। তৎপরে রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া দ্রৌণায়ণের রাজ্য যুগপৎ তিন স্থানে আক্রমণ করিলেন।

দ্রৌণায়ণ এই অনুতাপদৃপ্ত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসী মন্ত্রীর দুষ্প্রধর্ষ আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বারংবার পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ স্বশিবিরে বসিয়া আছেন। বিজয়ীর প্রায়শ্চিত্তশুদ্ধ ললাটে চক্ষে সন্তোষের জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছিল। কুঞ্চিত কেশকলাপ আবেষ্টন করিয়া লাবণ্যবিচ্ছুরিকা মুক্তামালা বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যের মতো শোভা পাইতেছিল। ক্রোড়ন্যস্ত কোষবদ্ধ কৃপাণ বিজয়ীর শান্তনিরুদ্বেগ প্রচার করিতেছিল। এবং ভদ্রসোমার প্রথম ও সকৃৎলিখিত পত্রখানি অনিমেষ-নয়নে দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিতেছিলেন—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥"

তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, দ্রৌণায়ণ রাজকুমার ভদ্রমুখ সন্ধিদূত হইয়া আসিয়াছেন। ঝল্লকণ্ঠ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভদ্রমুখ বলিলেন, "আপনার স্বরাজ্য আপনি পাইয়াছেন, এক্ষণে আর বিরোধ কেন? সন্ধি করিয়া শান্তি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছুক।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "রাজকুমার, আপনারা ইচ্ছুক হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইচ্ছুক নহি। আমি যে উদ্বেগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি, তাহার পূরণ ও প্রতিশোধ আমি চাই।"

"তবে এই লও প্রতিশোধ" বলিয়া ভদ্রমুখ গুপ্ত কৃপাণিকা আমূল ঝল্লকণ্ঠের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় দ্বাররক্ষক প্রচার করিল, "রাজকুমারী ভদ্রসোমার দূত আসিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণার কাতরধ্বনি নিঃসৃত হইতে হইতে ক্ষান্ত হইল। কেহ জানিল না মন্ত্রীর কি সাংঘাতিক অবস্থা হইয়াছে। তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া আবেগোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "কই, কই, সে দূত কই? তাহাকে শীঘ্র আসিতে দেও।"

রাজকুমারীর দূত জম্বিল প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে শোণিতাপ্লুত লুণ্ঠিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে বহুলোক সমবেত হইয়া মন্ত্রীকে তদবস্থ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

মন্ত্রী সকলকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিয়া, বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে অপসৃত হইলে জম্বিলকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

দূত নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, এ কার্য্য কে করিল?"

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট!—উপলক্ষ রাজকুমার ভদ্রমুখ।"

জম্বিল বলিল, "কেন কেন, তাঁহার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? বীর হইয়া এই গুপ্তহত্যা-প্রবৃত্তি কেন জন্মিল?"

ঝল্লকণ্ঠ কষ্টনিঃসৃত কণ্ঠে বলিলেন, "এও অদৃষ্ট!—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট আমি নিজের স্বার্থের জন্য প্রভুরাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলাম;—সে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়াও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল;—বীর শত্রুর প্রার্থিতসন্ধি উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টের প্রতিদান এই পাইয়াছি।—যাক সে কথা, এক্ষণে তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, শীঘ্র বল—আমার সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে।"

জজ্যিল আপনার উষ্ণীষাবরণ হইতে একখানি পত্র মুক্ত করিয়া ঝল্লকণ্ঠের হাতে দিল।

ঝল্লকণ্ঠ সেই চন্দনকুঙ্কুমলিপ্ত সুগন্ধী লিপিখানি লইয়া চোখের কাছে কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃত্যুচ্ছায়সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে লিপিখানির একটি বর্ণও পড়িতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বুকে ললাটে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনাচ্ছন্ন পত্রখানি জজ্যিলকে দিয়া বলিলেন, "জজ্যিল, ভগবান আমাকে প্রেয়সীর হস্তাক্ষর দর্শনসুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন; শ্রবণশক্তি অবিকৃত থাকিতে থাকিতে তুমি ইহা পাঠ কর; আমার দৃষ্টিতে আবিল্য আসিয়াছে, মৃত্যুর প্রাণহীন শীতলহস্ত আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিতেছে, সমস্ত মসীলিপ্ত দেখিতেছি,—তুমি পত্র পাঠ করিয়া শুনাও, শীঘ্র পাঠ কর।"

জজ্যিল আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল—

"স্বধর্ম্মকর্ত্তব্যনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সচিবশ্রেষ্ঠ ঝল্লকণ্ঠ শ্রীকরকমলোপায়ন—

"ওহে দয়িত, ওহে বাঞ্ছিত, ওহে বল্লভ, তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট স্বার্থান্ধ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, পুটপাকপ্রতীকাশা অন্তর্গূঢ় ঘনব্যথা হৃন্মর্ম্মে অস্ফুটিত ব্রণের রূঢ় গ্রন্থির ন্যায়, ঘনীভূত শোক নিশিদিন বিষদিগ্ধ শল্যের মতো জ্বালা দিয়াছে। তোমার আত্মোপলব্ধি তোমাকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিয়া আজ আমার কৃতঘ্নতব্যথ চিত্ত তাহার সমস্ত রুদ্ধ পূজা দিয়া তোমাকে অভিনন্দন

করিয়া স্বাধিকারে আবাহন করিতেছে ;—এস ওগো গৌরবদীপ্ত সুন্দর, ফিরেএস ; ওহে হৃদিরঞ্জন, হৃদয়মন্দিরে ফিরিয়া এস ; ওগো প্রত্যাখ্যাত, দ্বারোপান্ত হইতে ব্যর্থমনোরথ লইয়া ফিরিয়া গিয়া, ওহে প্রাপ্তসর্ব্বগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ, আমার চিত্তরাজ্য জয় করিয়াছ, তোমার স্নেহচ্ছায়ে উহাকে পালন কর। আমার মানস-আদর্শ তোমার ব্যবহারে কলঙ্কম্লান হইয়াছিল, আজ তোমার প্রায়শ্চিত্তপূতচরিত্র তাহাকে রাহুমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জ্বলতর, ভাস্বরতর করিয়াছে—আমার মানসমুকুরে তোমার গৌরব-মুকুটের দীপ্তচ্ছায়া দেখিবে, এস ওগো এস। আমার অটল বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বকার সরল কোমল স্নেহবন্ধন অটুট, অক্ষুণ্ণ ও প্রীতি-যোগ অপরাজিত রহিয়াছে। ওহে হৃদয়দেবতা, আমার সর্ব্বস্বরচিত বিচিত্র অর্ঘ্য তোমার চরণে ঢালিয়া দিব, এস ওহে ফিরে এস। ইতি—পূজার্থিনী ভদ্রসোমা।"

পত্র পঠিত হইলে ঝল্লকণ্ঠ মরণরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "জজ্বিল আমার হইয়া তুমি রাজকন্যাকে বলিয়ো, আমি বলিতেছি—'দেবি,—মূঢ় আমি,—তোমায় পাইবার উপায় ভুল বুঝিয়া কর্ত্তব্যপথক্ষুণ্ণ হইয়া তোমায় পাইয়াও পাই নাই।—মূঢ়তানুষ্ঠিত পাপ তোমার জন্যই করিয়াছিলাম—ইহাই আমার সান্ত্বনা।—তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ,—আমাকে তোমার পূজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,—ইহা জানিয়া মরিতেও সুখ।—মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্লানিহরা লিপিখানি আমার মৃত্যুসরণি সরল সুন্দর করিয়া দিল।—আমি ধন্য—আমি আজ সার্থকপ্রেম!—জজ্বিল, আমি আজ এই মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমার অস্খলিত প্রীতির নিদর্শন কি দিব ;—তাঁহার প্রথম প্রণয়সম্ভাষমধুরা লিপিখানি আমার বক্ষে নিশি দিন রক্ষা করিয়াছি—তাহাই লইয়া তাঁহাকে দিও।"

এই বলিয়া ঝল্লকণ্ঠ অঙ্গরক্ষণীর বন্ধনমুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, জজ্বিল সসম্ভ্রম তৎপরতায় তাঁহাকে সাহায্য করিল। অঙ্গরক্ষা উন্মুক্ত

করিয়া দেখিলেন, বক্ষবিদ্ধ কৃপাণিকা পত্রখানির একাংশ ছিন্ন করিয়া বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে। সেই ছিন্ন রক্তাক্তলিপ্ত পত্রখানি চুম্বন করিয়া জজ্বিলের হাতে দিলেন; তার পর বক্ষ হইতে সবলে কৃপাণিকাফলক নিষ্কাসিত করিয়া জজ্বিলকে দিয়া বলিলেন:—

"যাও জজ্বিল,—আমার হৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা তাঁহাকে দিয়া বলিয়ো, 'এই কৃপাণিকা আমার শত্রু হইয়াও হিতকারী—সে প্রেয়সীর প্রণয়ানুপ্রাণিত হস্তাক্ষর আমার বুকের মধ্যে পূরিয়া দিয়াছে,—প্রেয়সীর প্রণয়গর্ভ বাণী আমি হৃদয়ে বহন করিয়া মরিব,— আমাকে কেহ আর তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না,—আমি সার্থক প্রেমের পুষ্প-ক্রোড়ে মরিতেছি।—আমি সুখী।—ভগবান, পরকালে অপরিণত প্রণয়-প্রসঙ্গ যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, প্রারম্ভমাত্রসাঙ্গলীলা ভদ্রসোমাকে সান্ত্বনা দিয়ো—হে ভগবান—"

বক্ষের ক্ষতমুখে রক্তোচ্ছ্বাস হইল, মরণস্তব্ধ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ শয্যায় অসাড় জড় পতিত হইলেন।

প্রত্যাবৃত্ত জজ্বিল প্রণয়প্রাণ মন্ত্রীর সকল বাক্য যথাযথ নিবেদন করিয়া প্রগাঢ়শোকোদ্বেগস্তম্ভিতা রাজকুমারী ভদ্রসোমার চরণপ্রান্তে রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা ও পত্রিকা দুখানি রাখিয়া দিল।

ভদ্রসোমার শোক উচ্ছ্বাসাতীত, অনুমেয়গাধ; রক্তলিপ্ত উপহারগুলি দেখিয়া অক্ষিকোণে শুধু দুটি বিন্দু লাবণ্যবিচ্ছুরিত অশ্রু নিটোল মুক্তাফলের মতো দীর্ঘ নীরন্ধ্র পক্ষ্মাশ্রয়ে দুলিয়া উঠিল; তিনি রক্তলিপ্ত পত্রিকার একখানি মস্তকে কবরীর মধ্যে, অপর খানি বক্ষাবরণান্তরালে রক্ষা করিলেন; তার পর, দয়িতহৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকাখানি চুম্বন করিয়া ললাটে মস্তকে স্পর্শ করিলেন;—সীমন্তললাটে রক্তরাগদীপ্তি সধবার প্রিয়ানুরাগচিহ্নিত সিন্দূরশোভার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেবিকা

গৌড়নগরনিবাসিনী শ্রীমতী কুলীনকন্যা, কুলীনপত্নী, কৌলীন্যের অন্যতম প্রথম বলি। শৈশবে জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বেই সামাজিক উপদ্রব বিবাহ নামক একটা উপসর্গ তাহার জীবনে জুটিয়াছিল ; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সজ্ঞানে এক দিনের জন্যও স্বামী নামক অপূর্ব্ব জীবের শ্রীপদারবিন্দ-সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

স্বামিদেবতা বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, কাল তাহাকে ভুলিয়া ছিল না। কালে ফুল্ল যৌবনশ্রী তাহার নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল ; পুষ্পস্তবকবিভূষণা নবমল্লিকার মতো শ্রীসম্পদে দীপ্ত হইয়া উঠিল। নয়নে অলসমদিরভাব, চরণে সবিলাস গতি, সর্ব্বাঙ্গে সরমসঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল ; মানসক্ষেত্রে মনোভব সমরতাণ্ডবে নাচিয়া উঠিল। সামাজিক শাস্ত্র প্রতিনিয়ত তাহার কর্ণরন্ধ্রে স্বামিদেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্যের দুন্দুভিনিনাদ করিতে থাকিলেও, বিষমসমরবিজয়ীর বিজয়নিশান প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বিচিত্র বিভবে প্রস্ফুত হইয়া পড়িয়াছিল।

একদা বিহঙ্গসঙ্গীতনন্দিত পুষ্পবহুল বসন্তের অরুণিত প্রভাতে সে দেখিল গঙ্গাস্নাত, কৌষেয়পরিহিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হাতে সাজি ধরিয়া পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে ; নবারুণের লালিমদ্যুতি তিলকত্রিপুণ্ড্রক-চর্চ্চিত প্রশান্ত প্রশস্ত ললাটে মহেশের শশিনেত্রের মতো জ্বলিতেছে। পুষ্পবনে দীপ্ত স্থলপদ্মের মতো তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু চঞ্চল হইল, মনোভব হাসিল, শ্রীমতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—

'তুমি কে, তুমি কে গো, এই দীপ্ত প্রভাতে পুষ্পবনে অরুণের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছ ? তোমার বৈদ্যুতশক্তি যে আমার অন্তরের অন্তরে প্রস্ফুত হইয়া পড়িল ! এ কি, ওগো এ কি ! আমার প্রাণে আজ মধুপবন্ধুত

শত শতদল বর্ণগন্ধগানে এক সঙ্গে কেন ফুটিয়া উঠিল? এস, এস, ওহে শতদলবিহারী আমার অন্তরে এস, ভাবরাগবাকতানে তোমার পূজা করিব, এস এস হে'।

শ্রীমতী দাবদগ্ধা হরিণীর মতো সর্ব্বসন্তাপহা শীতল জাহ্নবীজলে গিয়া পড়িল, তবু চিত্তজ্বালা নিভিল না। 'শিবায় নমঃ' বলিয়া ফুল দিতে গিয়া 'গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া অন্তরবিজয়ীর পূজা করিল। শ্রীমতী গহন মাঝে দিক্‌বিদিক্‌ হারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—

'হে ভগবান, এ কি করিলে, এ কি হইল? গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে আবাল্য কতদিন কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এ কি কুক্ষণে বা সুক্ষণে সে আমায় দেখা দিল? হে অন্তর্যামী, তার মধ্যে আজ এমন কি ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে তাহাকে আজ অতুল শোভায় সজ্জিত দেখিলাম; অথবা হে বিধাতা, আমার মনেই কি এমন কিছু অঘটন ঘটনা ঘটিল যাহাতে আজ আবাল্যদৃষ্ট অবিশেষকে সবিশেষ শোভন করিয়া গ্রহণ করিল? এ কোন অয়স্কান্তমণি, যাহার স্পর্শে লৌহ কনককান্তি লাভ করিল, এ কোন স্পর্শমণি যাহার সংসর্গে মৃৎপিণ্ড রত্নদ্যুতি বিকীর্ণ করিল? ও গো এ কি, কি এ?'

শ্রীমতীর চিত্তবিপ্লব গোবিন্দের অন্তরে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝিল, মনোভব সরসভাবের দিব্য সরণি নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ের চিত্তসংযোগ সাধন করিয়াছে। গোবিন্দের প্রাণও কাঁদিল—

'হে মনোমথ, তোমার এ কি খেলা? তোমার মোহনস্পর্শে আমার চিত্তে যে অসংখ্য ভাবকুসুম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হে অঘটনঘটনপটু, তাহা সার্থকতা লাভ করিবে কোথায় হে, ওহে কেমন করিয়া?'

এক্ষণে মন্মথ যদি বাদ সাধিল, তবে তাহাদের সহজ দৃষ্টিমিলন প্রথমে চকিত হইল, ক্রমে সলজ্জ, অবশেষে করুণ হইয়া উঠিল। যখন দুটি

প্রাণ প্রণয়ের আকর্ষণে পরস্পরাভিমুখী হয়, তখন কি জানি কেন আন্তরিক নৈকট্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দূরত্ব আসিয়া পড়ে।

এক্ষণে শ্রীমতীর স্বামিদেবতার কাল্পনিক পদারবিন্দ অপেক্ষা তাহার প্রতিবেশী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ফুল্ল মুখারবিন্দ অধিক তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও স্বর্গসুখের আভাস দিতে লাগিল।

পল্লীধুরন্ধরগণের ইহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না—প্রণয়ের ধর্ম্মই প্রকাশ। কটাক্ষ, বিদ্রূপ, তিরস্কার তাহাদের সঙ্কুচিত দুটি প্রাণকে সহানুভূতির গূঢ়স্রোতে অতি দ্রুত অতি দৃঢ় মিলিত করিয়া দিল। উভয়ে উভয়কে বলিল—

'এস এস, ওগো বাঞ্ছিত,আমার নিগ্রহনিভিন্নহৃদয়ে তোমার মধুমুরতি বরণ করিয়া লই। তুমি দুঃখরূপে এস আমাকে অধিকার কর, ওগো আচ্ছন্ন কর!'

শ্রীমতীর বিফলপ্রেম রত্নমালার মধ্যমণির মতো গোবিন্দের বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; গোবিন্দের প্রণয় চন্দনপ্রলেপের মতো শ্রীমতীর জ্বালাময় হৃদয় শীতল করিল।

মিলনের প্রথম উল্লাস ও উন্মাদনা যখন শ্লথ হইল, তখন শ্রীমতী দেখিল, সমাজ সমাজ, সে একের সুখদুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সে বেশ বুঝিল, তাহাদিগকে নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, গৃহতাড়িত, পতিত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত করিবার বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে। তখন শ্রীমতী চিন্তা করিতে লাগিল—

'সমাজ, তোমার প্রবল ইচ্ছার কাছে আমরা কি কিছু নহি? হৃদয়, প্রেম, বাসনা, ইচ্ছা, স্বাধীনতা বলিয়া কি সম্মানযোগ্য কিছু নাই? আমার চিত্ত যাহাকে চাহে, সে আমার কেহ নয়; তুমি যাহাকে দয়া করিয়া দিবে, সেই প্রসাদ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? আচ্ছা বেশ! প্রবলের জয় হউক! আজ আমি একজনকে ভালো বাসিয়াছি

বলিয়া তোমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে ; এমন দিন আসুক আমার জীবনে, হে ভগবান, যখন সমাজের প্রত্যেককে আমি গোবিন্দের মতো ভালোবাসিব, অথচ লোকে আমার জয়গান করিবে। এখন যাহারা আমায় দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করিতেছে, তাহারা আমার প্রসাদলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে।'

তদবধি শ্রীমতী আত্মসংবরণ করিল।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীমতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, স্তব্ধ হইল, সম্ভ্রমে মুহ্যমান ও সঙ্কুচিত হইল। তাহাকে দেখিয়া যে শ্রীমতীর তুষারকুন্দেন্দু-মৃণালরজতপ্রভ শুভ্র-শীতল হাসিখানি মেঘবেষ্টনী বিদ্যুতের মতো তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত, [illegible] দৃষ্টি তাহাকে অভ্যর্থনা করিত, কপোলরাগ অরুণিত হইয়া উঠিত, সেই তাহাকে দেখিয়া সেই শ্রীমতীর মুখের একটি ক্ষুদ্রতম পেশীও বিচলিত হইল না। শুধু চিত্তজয়ের অনবদ্য বিরাট আনন্দ তাহার চক্ষু হইতে স্ফুরিত হইতে দেখিয়া গোবিন্দ শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে পুলকাঞ্চিত হইল, মনে মনে শ্রীমতীর সংযমনশক্তিকে প্রণাম করিল।

এইরূপে দিন গেল, মাস গেল। আচারের ব্যতিক্রম ঘটিল না। গোবিন্দ শুধু সপ্রশংসদৃষ্টিতে শ্রীমতীকে পূজা দান করে ; শ্রীমতীর প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে কি বলে, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। শ্রীমতীর যে দৃষ্টিতে শুধু তরল প্রেম ক্ষরিত হইত, তাহা লইয়া গোবিন্দ নিপুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এখন তাহা তাহার একলার নিজস্ব নহে, তাহা সকলেরই, তাহা সাধারণের। সেই অকাতর অসঙ্কুচিত দৃষ্টিতে গোবিন্দ তাহার জন্য বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাইত না,—তবু গোবিন্দ তাহা হইতে নির্ব্বিকার প্রীতি লাভ করিত।

সমাজ অগত্যা শান্ত হইল। বুঝি পূতসংযমশীলা শ্রীমতীর কাছে নতি স্বীকার করিল।

শ্রীমতী সর্ব্বদা প্রার্থনা করিত,—'ভগবান, তুমি একের প্রীতি সকলকে বাঁটিয়া দিলে; সেই শুভ অবসর আসুক—সকলে ইহা ভোগ করুক, আমার জীবন সার্থক হোক। তুমি আমার জীবনে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দাও, যখন আমি দ্বিধা-বিরহিত হইয়া সকলকে প্রাণের প্রীতি পরিবেষণ করিয়া দিতে পারি। তুমি গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া প্রীতিরূপে আমার চিত্তমন্দিরে প্রকাশিত হইয়াছিলে, এখন বিশ্বরূপে যদি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, তবে, হে প্রভু, আমাকে সেই বিশ্বরূপের পূজার অবকাশ দেও; আমার শরণীয় শ্রেয় ও প্রেয় পন্থা নির্দ্দেশ কর।'

ভগবান সে প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ করিলেন। গৌড়নগরে মহামারী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে কবলিত হইতে লাগিল। যত সম্পন্ন গৃহস্থ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। শ্রীমতীর পিতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় পলায়নের উদ্যোগ শেষ করিয়া যখন শ্রীমতীকে আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীমতী বলিল—

'আমার জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত আজ আসিয়াছে, ওগো আজ আসিয়াছে। আজ আমি বিশ্বজনের সেবা করিয়া ধন্য হইব, পবিত্র হইব, পূর্ণ হইব। আমার ব্যর্থ জীবন রক্ষার জন্য কেন পলাইব? সেবা-উৎসর্গিত জীবন আমার সার্থক হউক, ওগো সার্থক হউক। শুভাকাঙ্ক্ষী যে কেহ থাক আশীর্ব্বাদ কর, ওগো আশীর্ব্বাদ কর।'

শ্রীমতী রহিল। আর রহিল নগরত্যাগসক্ষম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তাহারা পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা ও যত্নে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিল।

নিপুণ সেবিকা শ্রীমতী নিত্য দ্বারে দ্বারে ঔষধ ও সেবা লইয়া ফিরে, গোবিন্দ তাহার নিরাপত্ত মূক অনুগত আজ্ঞাবহ। শ্রীমতীর বিশ্বসেবায় যে সুখ, সেবিকার সাহায্যে গোবিন্দের সেই আনন্দ—অনাবিল, অনবদ্য।

যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতীকে তাড়িত লাঞ্ছিত করিবার ষড়যন্ত্র

করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার সঙ্গলাভের জন্য অধিক ব্যস্ত। এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে এখন তাহারা কাতরকণ্ঠে বলে, 'থাক মা থাক, শরীরিণী শুশ্রূষা বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের মতো আমাদের রোগক্লিষ্ট শিয়রে বসিয়া থাক।'

যাহারা তাহাকে অসতী বলিয়া বিশেষভাবে নাসিকাকুঞ্চন করিয়াছিল, তাহারাই এখন বলে, 'তুমি পুণ্যবতী, ওগো সতী সাধ্বী।'

ক্রমে গোবিন্দের পালা আসিল। সে রোগগ্রস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িল; সে কাতরতা রোগযন্ত্রণায় নহে, শ্রীমতীকে মহৎব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিতে বঞ্চিত হইয়া।

তপিষ্ঠা শ্রীমতী গোবিন্দের শয্যাপার্শ্বে দিব্য প্রশান্ত মুখে আসিয়া দেখা দিল। গোবিন্দ প্রথম মুহূর্ত্তে সুখাতিশয্যে একটু বিচলিত হইল, তাহার ভাবভারি অক্ষিপুট নিমীলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—

'শ্রী, শ্রী, ওগো শ্রী, তুমি এখানে কেন? কত অনাথ তোমার সেবালাভের জন্য সোৎসুক প্রতীক্ষা করিতেছে; তুমি তাহাদের কাছে যাও, আমার কাছে থাকিয়ো না।'

শ্রীমতীর মুখ সহাস নহে, অথচ প্রদীপ্ত। এ দিব্য শ্রী সেই তপঃকৃশা কোথায় পাইল? সে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'গোবিন্দ, তুমি মনে করিয়ো না, যে, আমি অধিক প্রীতি লইয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি। তুমি নগরের দরিদ্রতম ভিক্ষুক হইলেও এখন আমি আসিতাম; এখন তোমার সেবার পালা; আমার কর্ত্তব্য শেষ হইলেই অন্যের সেবায় চলিয়া যাইব। গোবিন্দ, দীনতম হীনতম নাগরিক আমার যতখানি প্রিয়, তুমিও ততখানি, এখন একটুও বেশি নও। একটু কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধু তোমার নিকট আছে; ভগবান তোমাকেই উপলক্ষ করিয়া আমার রুদ্ধ-চিত্তের গুপ্তভাণ্ডার বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।'

গোবিন্দের মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন চক্ষু প্রশংসা, সম্ভ্রম, প্রীতি, ভক্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ধন্য, শ্রীমতী তুমি ধন্য, আর তোমাদের দয়াতে আমিও ধন্য। ঈশ্বরের চরণে কোটি নমস্কার, তোমার চিত্তজয়ের বিরাট শক্তিকে শত শত নমস্কার, দেবি, তোমার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রীতিকে সহস্রবার নমস্কার, সাধ্বি, তোমার চরণে বার বার নমস্কার!'

আবেগ-উত্তেজিত প্রেমিকের উত্থিত মস্তক শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শ্রীমতী ডাকিল, 'গোবিন্দ!' মরণাহত প্রেমিক উত্তর দিল না। অবিকম্প অনিস্পন্দ কণ্ঠে শ্রীমতী আশীর্ব্বাদ করিল 'তুমি আজ ভগবানের চরণ-সদাব্রতে চিরঅতিথি হইলে, যাও, তোমার আত্মার কল্যাণ হোক।'

তারপর শ্রীমতী মরণাক্রান্ত অপরগৃহে চলিয়া গেল,—গোবিন্দের জন্য একটি দীর্ঘনিশ্বাসও বুঝি নির্গত হইল না।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আমার সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমার প্রাণ রমণীপ্রেমে সরস নহে বলিতেছ? তবে আমার জীবনের একটি কাহিনী শুন; বুঝিতে পারিবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর প্রাণও অতি কোমল, রমণীর সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের প্লাবনে পরিপ্লুত; সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়ই সুখদুঃখের আলো ও ছায়ার ক্রীড়াক্ষেত্র।

আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়া শ্বেতাম্বরাচার্য্যের আশ্রমে পালিত হইয়াছিলাম। আশ্রম-পালিত বলিয়া শৈশব হইতেই জ্ঞানপিপাসু হইয়াছিলাম। চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়ঃকাল পর্য্যন্ত আমি নানা বিদ্যা অধিগত করিতে এতদূর ব্যস্ত ছিলাম যে, সাংসারিক জ্ঞান আমার মোটেই স্ফূর্ত্তি

লাভ করিতে পারে নাই। পুলস্ত্যপুরীর উপকণ্ঠে আচার্য্যের আশ্রম ; নিদ্রিত শিশুর শিয়রে জাগ্রত জননীর মতো বিন্ধ্যগিরির হৃদয়নিঃসৃত তমসানদীর স্নেহধারা আশ্রমটিকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। আশ্রমে কত ফুল ফুটিত, কত পাখী ডাকিত, কত হরিণশিশু, কত গোবৎস, উদ্দাম আহ্লাদে ক্রীড়া করিত। আমার কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না। "অজরামরবৎ" বিদ্যা অর্জ্জন করিবার উপদেশ পাইলেও আমার ক্ষুধার্ত্ত প্রাণ—জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিত ; মুখের গ্রাস পাছে ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে সে সর্ব্ববিধ জ্ঞান একেবারে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এজন্য আশ্রমের সৌন্দর্য্যে, পুলস্ত্যপুরীর ঐশ্বর্য্যে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার চিত্ত বেদ ও সায়ণের ভাষ্যে, মহাভারত ও নীলকণ্ঠের টীকায়, বেদান্ত ও শঙ্কর-রামানুজে, কাব্য ও ব্যাকরণে একান্ত নিরাশ্রয়ভাবে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বিপুল অরণ্যের শতপথের কোনটি আশ্রয় করিলে বাহিরে যাইতে পারিব, বিশাল জলধির কোন দিকে গা ভাসাইলে শীঘ্র কূল পাইব, এই চিন্তাতেই আমার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। অনধ্যায়ের দিন আমার সহপাঠিগণ নগর-ভ্রমণে যাইতেন, আমি তমসার তীরে উপল আসনে বসিয়া আমার অধীত বিদ্যার আলোচনা করিতাম। চিন্তায় চিন্তায় রাত্রি হইয়া যাইত ; আচার্য্যের আদেশ-প্রেরিত বিরক্ত সহাধ্যায়িগণ বহু সন্ধানে আমাকে বিদ্রূপ উপহাসে আহ্বান করিয়া আশ্রমে ফিরিত ; পথে তাহাদের নগর-ভ্রমণ-কাহিনী শুনিতাম, কিছু বুঝিতে পারিতাম না। আমি আমার নির্জ্জন গ্রাম ও আচার্য্যের আশ্রম ভিন্ন অন্য কোনো স্থান দেখি নাই।

কাব্যেতিহাসে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কত কি পড়িতাম ; তাহাদের অস্পষ্ট পরিচয় আমার মনের এক কোণে পড়িয়া ছিল। কোনো স্ত্রীলোকের সহিত আমার সম্বন্ধ না থাকাতে, তাহাদের বিষয় আমার চিন্তাতেও আসিত না।

যখন আমার বয়স চতুর্বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিল, তখন একদিন আচার্য্য আমাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস ইন্দ্রভূতি, তোমার শিক্ষাকাল পূর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে, বিবাহ করিয়া সংসার আশ্রম অবলম্বন করিতে হইবে; তুমি তজ্জন্য প্রস্তুত হও।'

আচার্য্য আমাকে চিনিতেন, তাই এত করিয়া বার বার আমাকে দ্বিতীয়াশ্রম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। যে-সকল ছাত্রের আমার মতো ব্রহ্মচর্য্যত্যাগের সময় আসিয়াছে, তাহারা তাহাদের আসন্নমুক্তি স্মরণ করিয়া আমার দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া আমার প্রসন্ন ভাগ্যকে অভিনন্দন করিল; যাহাদের এখনো বিলম্ব আছে, তাহারা আমার দিকে ঈর্ষা-ব্যাকুলচক্ষে তাকাইল; কিন্তু আমার পক্ষে আচার্য্যের আদেশ বজ্রাঘাত-তুল্য বোধ হইল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি যেমন নিমেষমধ্যে আপনার অবস্থা, অতীত ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ, ধরণীর শোভা সম্পৎ, স্মরণ করিয়া লয়, ও পর মুহূর্ত্তে বধমঞ্চ ও ঘাতককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, আমিও তেমনি আচার্য্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। আমি আচার্য্যের পদযুগল অশ্রুধৌত করিয়া কহিলাম, 'প্রভু, আপনি এ নিদারুণ আজ্ঞা করিবেন না; আমার আত্মার ক্ষুধা আজিও মিটে নাই; হে দেব, আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন।'

আচার্য্য সস্নেহে আমাকে পদতল হইতে উত্তোলন করিয়া নিজের ক্রোড়ের মধ্যে টানিয়া লইলেন, এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে হস্তামর্ষণ করিতে লাগিলেন, কোনো কথা কহিলেন না। বুঝিলাম প্রশান্তজলধিতে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণেক পরে গদ্গদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'বৎস, তোমার জ্ঞানপিপাসা অদ্ভুত, অসাধারণ। কিন্তু এরূপ জ্ঞান অসম্পূর্ণ, একদেশী। জ্ঞানভাণ্ডারের চাবী তোমার আয়ত্ত হইয়াছে; সংসারাশ্রম অবলম্বন

করিয়া তুমি জ্ঞানচর্চ্চা করিলে তোমার জ্ঞান সর্ব্বতোমুখ হইবে; তোমার চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতিলাভ ঘটিবে। অতএব বৎস, আমার উপদেশ শুন, তুমি দ্বিতীয়াশ্রমে প্রবেশ কর।'

আমি পূর্ব্ববৎ কাতরভাবে বলিলাম, 'প্রভু, আমি আপনার অনুজ্ঞাত বিষয় কোনো দিনও চিন্তা করিয়া দেখি নাই। পাঠপ্রসঙ্গে যদি বা কথনো চিন্তার আবশ্যক হইয়াছে, আমি এই আশ্রমবহির্ভূত জীবন কল্পনা করিতে পারি নাই। আমি সংসার জানি না; লোক-চরিত্র চিনি না; আমাকে অসহায় অবস্থায় জটিল অরণ্যে নিক্ষেপ করিবেন না।'

গুরুদেব আবার চিন্তিত হইলেন। সদাপ্রফুল্ল গৌর মুখশ্রী দীপ্ত লোহিতাভা ধারণ করিল; প্রশান্ত নয়নদ্বয় স্নেহ-সিক্ত হইয়া উঠিল; দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু বাহিয়া দুটি বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আমার মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিল; আচার্য্য আমার মস্তক চুম্বন করিলেন। তৎপরে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'আগামী পৌর্ণমাসীতে তোমাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত করিব; বৎস, তুমি ইহার মধ্যে আমার পূর্ব্ব আদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিয়ো। যে পথ শুভতর হইবে তাহাই আশ্রয়নীয়।'

* * * * *

আজ আমার চিরবাঞ্ছিত পৌর্ণমাসী। আজ আমার দীক্ষার দিন। ক্ষুদ্র আশ্রমটিতে আজ বড় সমারোহ; সতীর্থগণ অতি প্রত্যূষ হইতে আশ্রমটিকে পুষ্পপত্রবল্লীশোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। সমিধ পুষ্পচন্দন আহৃত হইতেছে, গোদোহন ও দধিমন্থনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বেদ-গায়ত্রী গান করিয়া সতীর্থ-সঙ্গে স্নান করিয়া আসিলাম। হোমগন্ধে শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। এত আনন্দ কোনো যুবক বিবাহ-বাসরে পাইয়াছে কি না সন্দেহ।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করার সংবাদ নগরে প্রচারিত হইয়াছিল। বহু নাগরিক সমবেত হইয়াছে; আর আসিয়াছেন সপারিষদ্ রাজা

বিজয়মিশ্র। আমার সতীর্থগণ অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমার এসকল বিষয়ে কোনো লক্ষ্য ছিল না।

আমার দীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইল। যথাবিধি হোমাদি সম্পন্ন করিয়া আচার্য্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার হস্তে দণ্ড-কমণ্ডলু দিবেন, এমন সময় আমার চক্ষু এক অপার্থিব মূর্ত্তি দর্শন করিল। এই কি নারী? নারী এত সুন্দর?

আমার মোহ-আবরণ ঘুচিয়া গেল। জন্মান্ধের যেন নয়নলাভ হইল। আমি পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইলাম; তাহার শোভা ও সম্পৎ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আচার্য্য আমার চক্ষে ভাস্করের মতো দীপ্ত ও চন্দ্রের মতো সুন্দর ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার লোহাস্থিময় শিরাবহুল দেহ আমার চক্ষে ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। এই নরকে কে তুমি দেবী স্বর্গ হইতে মূঢ় আমাকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছ? আমার জ্ঞানের বড় স্পর্দ্ধা ছিল, সে স্পর্দ্ধা টুটিয়া গেল। আমি চক্ষু অবনত করিলাম, মনে করিলাম, আর চোখ তুলিব না। তথাপি সেই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিখানি আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। বহুক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেও প্রতিচ্ছয় নয়নের সম্মুখে যেমন শত সূর্য্যচ্ছবি নাচিতে থাকে, আমারও সেই দশা হইল। আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হইতে লাগিল। আমার দর্শনবিজ্ঞান যাহা বুঝাইতে পারে নাই, আজ তুমি মৌনভাষায় তাহা বুঝাইলে; অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দ্বার মুক্ত করিয়া আমায় নবজীবন দান করিলে; নূতনতর চিন্তায় আমার চিত্ত মধুময় করিয়া দিলে।

আমার অসহ্য কষ্ট বোধ হইতে লাগিল; প্রতি মুহূর্ত্ত আমার মৃত্যুমুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য যখন দণ্ডকমণ্ডলু হাতে দিয়া বলিলেন 'গৃহাণ', তখন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় বিদ্রোহী হইলেও জিহ্বা বলিল 'গৃহ্লামি'। যে সংসারের দ্বারে আমার ব্যথিত আত্মা

পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমার ভাগ্যচক্র সেখান হইতে আমাকে দূরে, বহুদূরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল দণ্ডকমণ্ডলু দূরে টানিয়া ফেলিয়া দি,—হস্ত বজ্রমুষ্টিতে তাহা ধরিয়া রহিল। মনে করিলাম, হৃদয়ের সকল বলের সহিত চীৎকার করিয়া বলি, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব না; জিহ্বা জোরে তালুকে আঁকড়িয়া রহিল, একটিও বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। কেন এমন হইল? ভীরু যখন লোকের দেখাদেখি, নিজের ভীরুতা ঢাকা দিবার জন্যই যুদ্ধে যায়, তখন যুদ্ধাস্ত্রের দারুণ সম্ভাষণে ভীত হইয়া সে মনে করে, এই প্রাণান্তক বীরত্ব দেখানো অপেক্ষা আমার ভীরু থাকাই ভালো ছিল; কিন্তু তখন নিরুপায়; পৃষ্ঠ দেখাইলে সহস্র চক্ষুর ধিক্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। সকলের ইচ্ছায় তখন তাহার ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত; তখন প্রত্যাবর্ত্তনের ক্ষমতা সংগুপ্ত, বিলুপ্ত।

যত আমার দীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে লাগিল, তত সেই অপরিচিত ও চিরপরিচিত সুন্দরীর ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহার সেই নম্র স্নেহদীপ্ত বদনশ্রী যেন ঘৃণায় হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আর একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলাম। মুখ হইতে প্রতিষেধক একটি মৃদু শব্দও বাহির হইল না। স্বপ্নে প্রাণান্তকালেও যেমন একটিও কথা কহিতে পারা যায় না, আমার সেইরূপ অবস্থা; কেবল অবোধ্য মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছিলাম, তাহার একবর্ণও আমার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না। আমি ইসারায় আমার ইচ্ছা জানাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও পারিলাম না।

সেই সুন্দরী আমার অবস্থা বুঝিতে পারিল বলিয়া মনে হইল; তাই তাহার সদয় স্নিগ্ধ দৃষ্টি আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়া গেল। আমার বোধ হইতে লাগিল সে যেন বলিতেছে, 'হে পুরুষ, তুমি আমার হও, আমাতে এস; আমিই তোমাকে জ্ঞান দিব, নবজীবন দিব। যে মৃত্যুবন্ধনে

আপনাকে বিজড়িত করিতেছ, তাহা ছিন্ন করিয়া আমার বাহুবন্ধনে চলিয়া এস ; আমার বক্ষে শুধু আশা, আহ্লাদ ও জীবন ; আমিই সুন্দর, আমিই যৌবন, আমিই জীবন। এস, এস, হে বন্ধু, আমরা দুজনে একটি অনন্ত চুম্বনের সুখাবেশের মতো সংসারে ভাসিয়া চলিব। আমার প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি মাগিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছে, আমার নিরালম্ব প্রেম আশ্রয় খুঁজিয়াছে ; পায় নাই, হে, কোথাও পায় নাই। হে সুন্দর, আজ তোমায় পাইয়াছি ; আমার মানসকল্পিত পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমার মনোমন্দির ছাড়িয়া আজ বাহিরে আসিয়াছ ; এস হে ফিরে এস ; আমার চিরবাঞ্ছিত তুমি, আমার এই বক্ষ-স্বর্গে ফিরে এস ; তুমি তৃপ্তি পাইবে, আমি তৃপ্তি পাইব।'

তাহার করুণ দৃষ্টি হইতে যে সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইয়া আমার প্রাণের দ্বারে জোরে আঘাত করিতেছিল, তাহা আমি শুনিলাম, বুঝিলাম। আমি ধর্ম্ম, ঈশ্বর, ইহপরকাল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলাম ; কিন্তু আমার দীক্ষার সকল বিধিই পালিত হইল। সব শেষ হইয়া গেল। আমি লোকের চক্ষে এক্ষণে সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী! ধন্য লোকাচার! ধন্য তোমার প্রভাব! তুমি ভীরুকে বল দেও, তুমি বীরকে ভীরু কর।

সেই সুন্দরী আবার আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টিতে কী তীব্র তিরস্কার! তাহা বৃশ্চিকের হুলের মতো আমার প্রাণের উপর এক আঘাতে সহস্র বেদনা জাগাইয়া তুলিল। তখন তাহার মুখে চোখে যে হতাশ্বাস ও দুঃখ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেরূপ বুঝি আর কাহারো হয় না। দেখিলাম যেন তাহার সকল শিরা ধমনী হইতে রক্ত সরিয়া গিয়া হৃদয়ে জড়ো হইয়াছে ; তাহার অরবিন্দসুন্দর মুখখানি পাণ্ডুর ; তাহার মৃণালবাহু যেন রৌদ্রতাপে শুষ্ক বিমলিন ; স্থলপদ্মের মতো সুন্দর চরণ দুখানি ম্লান, স্ফূর্তিহীন, বলহীন। সে একটা পুষ্পলতাচ্ছন্ন

বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। তাহার মূর্ত্তি নিশ্চল, রক্তহীন,—যেন ভাস্করপ্রেয়সী মর্ম্মরমূর্ত্তি। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেই সময়ে আচার্য্যের আদেশ হইল, 'যাও বৎস, জ্ঞানচর্চ্চা ও জ্ঞানদানের জন্য জনসাধারণের সহায়তা ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আইস।' আমি মত্তপের মতো টলিতে টলিতে ভিক্ষায় বাহির হইলাম। কত লোক কত কি ভিক্ষা দিল; রাজা বিজয়মিশ্র বহু রত্নরাজি ভিক্ষা দিলেন; আমার সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর ও ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষা করিতে করিতে নগরের দিকে যাইতেছি, এমন সময় আমার হস্তে কাহার হস্তস্পর্শ হইল! আহা, সে স্পর্শ কি কোমল, কি উন্মাদন, কি অভাব্য, অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রদ! সে স্পর্শ সর্পত্বকের মতো মসৃণ ও সুখশীতল হইলেও, আমার হস্তের স্পৃষ্ট স্থান যেন তপ্ত লৌহে দগ্ধ হইয়া গেল। সে স্পর্শে আমার চেতনা হইল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি, আমারই আরাধ্যা দেবী আমায় ভিক্ষা দিতেছে। সে চুপি চুপি বলিল, 'হতভাগ্য যুবক, তুমি কি করিলে?' সে দূরে সরিয়া গেল। তাহার সেই কয়টি তীব্র ভর্ৎসনাবাক্য অজস্র টীকাভাষ্যমুখরিত নিগমান্তবিদ্যার মতো আমার নিকট কত নূতন, নূতনতর কথা ব্যক্ত করিয়া গেল। তাহার অকথিত বাণী যেন বলিতে লাগিল, 'হায় মূর্খ, তুমি আজ কি ছার মণিকাঞ্চনের ভিক্ষার্থী হইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ! অমূল্য নিধি তোমায় সাধিয়া দিতেছিলাম, তুমি তাহা লইলে না।' আমার প্রাণ শত ধিক্কারে কুণ্ঠিত হইয়া হায় হায় করিয়া উঠিল।

দেখিলাম, সেই মূর্ত্ত সৌন্দর্য্য, মূর্ত্ত যৌবন, মূর্ত্ত সুখ, মূর্ত্ত আনন্দ সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো একখানি রথে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিয়া গেল। সে যত দূরে যাইতে লাগিল, তত আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। হায় হায়, এই কি রমণী? ঐ কি রমণীর স্পর্শ? বুঝিলাম, রমণীই শরীরী জ্ঞান, আমি বৃথাই পুঁথির কীটদষ্ট পত্রের অক্ষর-পরম্পরায় জ্ঞান অন্বেষণ করিয়াছি। রমণী, তুমি আছ বলিয়া জগৎ

আছে ; তুমি সৎ, আর সমস্ত মিথ্যা ; তোমার রূপৈশ্বর্য্যের প্রতি কণিকায় জগৎ বাঁচিয়া আছে, সমস্ত তোমাতেই লয় হইতেছে। হায় হায়, এই ত বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদ। তুমিই ত প্রকৃত 'দর্শন' ; তোমাকে জানিতে পারাই প্রকৃত 'বিজ্ঞান'। তুমি লক্ষ্মী, তুমিই সরস্বতী। হে চিত্রকর, তোমার তুলিকারেখায় রমণীরূপের কণামাত্রও তুমি প্রকাশ করিতে পার না। হে রমণীরূপের ব্যর্থ টীকাকার কবি, তোমার লেখনী রমণীমহিমার ক্ষীণ ছায়াও আমাদের সম্মুখে ধরিতে পারে না। আমি বুঝিলাম রমণীই শরীরিণী কবিতা। রমণী স্বয়ং 'রুচিরা' ও 'প্রহর্ষিণী', তাহার কবরীই 'পুষ্পিতাগ্রা'। তাহার চক্ষে 'শার্দ্দূলবিক্রীড়িত', ললাটে 'বসন্ততিলক,' কণ্ঠমালিকায় 'মালিনী,' বাহুবিভঙ্গে 'ত্রোটক,' 'তূণক' প্রভৃতি ছন্দসকল খেলা করে ; 'ইন্দ্র-বজ্রা' ও 'উপেন্দ্রবজ্রা' তাহার বক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; তাহারই চরণভঙ্গে 'গজগতি' ও 'মন্দাক্রান্তা' ছন্দ বাঁধা রহিয়াছে। তাহার বিরহে আমার অন্তরে 'বিয়োগিনী' ছন্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার রথচক্রের ধূলিতে 'রথোদ্ধতা' ছন্দ নৃত্য করিতে লাগিল। সে কী সুন্দর! কী মহান্! জ্যোৎস্নালোকের মতো অতীন্দ্রিয় রূপ, বাসন্তী শোভার মতো সজীব চক্ষুদ্বয়, ঘোর বর্ষার মেঘের মতো সুদীর্ঘ নিবিড়-চিক্কণ চিকুরজাল, মুক্তাফলসদৃশ স্মিত-বিকশিত দন্তপাঁতি, তাহার গণ্ডে গোলাপফুল্লতা! সে হেমন্তের মতো কুহেলিকায় প্রচ্ছন্ন, প্রহেলিকাময়! এই নারী এমন, আগে যদি জানিতাম! ইহারই সহিত সম্বন্ধ বিবাহ? ইহার সহবাসই কি সংসারাশ্রম? হায় হায়, আমি কি করিয়াছি? হে অপরিচিতা, তুমি এমন অসময়ে আমার নিকট চিরপরিচিতার মতো আসিলে কেন?

আমার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিল; আমি ক্ষণে আরক্ত, ক্ষণে পাণ্ডুর, ক্ষণে দৃপ্ত, ক্ষণে অবসন্ন হইতে লাগিলাম। আচার্য্য তীক্ষ্ণ রূঢ় দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আমার এক সতীর্থ কৃপাপরবশ হইয়া

আমাকে ধরিয়া লইয়া ভিক্ষাসংগ্রহার্থ নগরাভিমুখে লইয়া চলিল। আমার সতীর্থ জাজালি আমাকে নগরের বহুস্থানে লইয়া বেড়াইল। এই নগর? অনাদ্যনন্ত সৌধশ্রেণী,—শ্বেত, পীত, লোহিৎ, নানা বর্ণের, নানা ছন্দের। কত বিপণি, কত ক্রেতা বিক্রেতা! কী বিশাল জনসঙ্ঘ! কী অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোত! এই নগর, এই সংসার! এতদিন আমি অন্ধের মতো কিছু দেখি নাই, কিছু বুঝি নাই। বোধ আসিল, কিন্তু এমন অসময়ে আসিল কেন? সুবিধা যদি আসে, তবে অসুবিধা সঙ্গে লইয়া আসে কেন?

আমরা ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কী বিশাল অট্টালিকা! কী সুরম্য উদ্যান! কী বিপুল ঐশ্বর্য্য! কাষায়-বস্ত্রপরিহিত সন্ন্যাসী আমি, আমার নিজের, আমার জ্ঞানের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া নিতান্ত খিন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। রাজপ্রাসাদ ছাড়াইয়া কিছু দূর যাইয়া প্রাসাদতুল্য আর একটি সুরম্য অট্টালিকা দেখিলাম। সতীর্থ জাজালি সেদিকে না গিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভ্রাতঃ, সম্মুখে ঐ অট্টালিকা কাহার? চল, ঐ দিক্ দিয়া যাই।' জাজালি আপনার মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'তাত ইন্দ্রভূতি, তুমি ঐ দিকে আর দেখিয়ো না; ঐ অট্টালিকার নাম 'পারাবত-ভবন', উহা পাপনিকেতন, উহার অধিষ্ঠাত্রী রাজনর্ত্তকী। উহা দর্শন করিয়ো না, উহাতে পাপ স্পর্শ করিবে।'

যেখানে বাধা, যেখানে আবরণ, সেইখানেই আগ্রহ। আমাকে বারণ করা হইল বলিয়াই যেন আমার চক্ষু ঔৎসুক্যভরে সেই আট্টালিকার দিকে চাহিল। তখন পথের বক্রতায় সেই অট্টালিকার প্রায় সবখানি অন্তরালে পড়িয়াছিল, কেবল একটি গবাক্ষ দেখা গেল। ঐ না আমার বাঞ্ছিতা বন্দিতা গবাক্ষলীনা! সে গবাক্ষও অদৃশ্য হইল। কিন্তু সে মূর্ত্তি আমার দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে সর্ব্বত্র, বিরাজিত দেখিতে লাগিলাম। অনুভব করিতে লাগিলাম, আমার

হস্তে হস্ত রাখিয়া সে করুণ কঠোর স্বরে বলিতেছে 'হতভাগ্য যুবক, তুমি কি করিলে!'

অগ্রে জাজালি, পশ্চাতে আমি, 'ভিক্ষাং দেহি' বলিতে বলিতে পথ অতিক্রম করিতেছি। যাহার যাহা ইচ্ছা আমার ঝুলিতে দিয়া যাইতেছে; আমার ঝুলি আমার মনের মতো ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি আমার চিত্ত ত ভরে না। ক্রমে নগর-উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; আশ্রমের পথে চলিলাম। রাজপথ ছাড়িয়া অন্য পথে যেমন ফিরিব, একটি বিবিধভূষণমণ্ডিতা রমণী সত্বর আসিয়া আমার ঝুলিতে কি দিয়াই দূরে চলিয়া গেল ও ইসারায় তাহা গোপন করিতে বলিল। জাজালি তখন পথের বক্রতায় আমা হইতে পৃথক, সে কিছু দেখিল না।

আশ্রমে আসিয়া আমি একক হইবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম। সে অবসর সন্ধ্যার পূর্ব্বে জুটিল না। সান্ধ্যকৃত্য সমাপনের পর আমি একাকী আমার একখানি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র কুটীরে যাইয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলাম। সত্বর সেই রমণীপ্রদত্ত দ্রব্য আমার বস্ত্রান্তরাল হইতে বাহির করিলাম—একটি স্বর্ণপেটিকা, বিচিত্র কারুকার্য্যময়। উহা খুলিলাম,—ভিতরে এক খণ্ড ভূর্জ্জপত্রে লিখিত,—"কুবলয়া,—পারাবতভবন"; পেটিকার ঢাকনীতে একটি নারীমূর্ত্তি বিবিধ বর্ণে চিত্রিত। এই ত আমার বাঞ্ছিতা, আমার বন্দিতা! সে পতিতা,—জগৎ সংসারের চক্ষে, আমার চক্ষে নহে; আমার ঘৃণা আসিল না। আমি বুঝিলাম কী দারুণ প্রেম-পিপাসায় জর্জ্জরিত হইয়া আমার কুবলয়া বহু অঙ্গার ঘাঁটিয়া, নিজে মসীলিপ্ত হইয়া একখানি হীরকের মতো উজ্জ্বল, নির্ম্মল, মহামূল্য প্রাণ অন্বেষণ করিতেছে। আমি দিব গো, তোমায় তৃপ্তি দিব; আমার প্রেম দিয়া তোমার ক্ষুধা মিটাইব, তোমার কালিমা দূর করিব, প্রেমে তোমায় দেবী করিব।

চক্ষের সমক্ষে 'পারাবত-ভবন' তাহার উচ্চচূড় অলিন্দচত্বর সহ ভাসিয়া

উঠিল, তাহারই একটি গবাক্ষলীনা আমার আরাধ্যা,—যেন আমায় বলিতেছে, 'হতভাব্য যুবক, কি করিলে!'

নহি, নহি, আমি হতভাগ্য নহি। স্থূল দেহের মিলন প্রকৃত মিলন নহে। তোমায় আমি মনোমন্দিরে পাইয়াছি, আমার জ্ঞানচর্চ্চিত কঠোর চিত্ত প্রেমপ্লাবনে দ্রব হইয়াছে। তোমায় না পাইলে হতভাগ্য থাকিতাম। আর আমি হতভাগ্য নহি, তুমিও পতিতা নহ।

পরমুহূর্ত্তে সব অন্তর্হিত হইল। তখন আমি উন্মত্তবৎ যেখানে তাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছিল, আমার হস্তের সেই স্থান চুম্বন করিতে করিতে লাল করিয়া তুলিলাম। "কুবলয়া, কুবলয়া" বলিয়া পেটিকাচিত্রিত মূর্ত্তিকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে লাগিলাম।

এই চুম্বন? এই আলিঙ্গন? আমায় কে শিখাইল? তাহার চক্ষের একটি দৃষ্টিতে আমার প্রাণে অযত্নসঞ্চিত প্রচ্ছন্ন প্রেমের প্লাবন আসিয়াছে; আমার যৌবন এক মুহূর্ত্তে আমার দেহ মন অধিকার করিয়া বসিয়াছে; মৃতসঞ্জীবনী একটি দৃষ্টিতে আমার নব-জীবন লাভ হইয়াছে। মন্মথ কি তাহার ইঙ্গিতানুবর্ত্তী? শুনিতেছি কুটীরে মশক গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে, 'হতভাগ্য যুবক, কী করিলে?' শৃগাল, পেচক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'হতভাগ্য যুবক, কী করিলে?' আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী—আমার পক্ষে রমণীর প্রেম, রমণীর সঙ্গ নিষিদ্ধ,—হায় হায়, আমার এ দশা কেন হইল? আমার কাষায়বস্ত্র আমারই শব-আবরণী বলিয়া মনে হইতে লাগিল, আশ্রমকুটীর আমার চিতাশয্যা বলিয়া বোধ হইল। একটি ক্ষণিক দৃষ্টির বিনিময়ে এত একাগ্রতা, এত প্রেম, এত আগ্রহ কেন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অধিকার করিয়া বসিল? নানাবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তায় ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাবেশ আসিল!—সে নিদ্রা স্বপ্নসঙ্কুল,—স্বপ্নে সেই কুবলয়া!

প্রাতঃকালে তমসার তীরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম,—সেই কুবলয়া। দেখিলাম—

"মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥"

মল্লিনাথের টীকা যাহা আমায় বুঝাইতে পারে নাই, কুবলয়ার একটি সকরুণ দৃষ্টি আজ তাহা আমাকে বুঝাইল। হায় হায়, আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী! আর একবার মাত্র কুবলয়াকে দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু আমি নগর চিনি না, সেখানে আমার কেহ পরিচিত নাই, আশ্রম ছাড়িয়া যাওয়ার ছলও স্থির করিতে পারিলাম না। কুবলয়া, এত দুষ্প্রাপ্য তুমি! আমি নিরাশ্বাসে নিরাশ্রয়ভাবে উপলাস্তীর্ণ বন্ধুর তমসাতটে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি, জাজালি সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া আছেন। আমি লজ্জায় হস্ত দ্বারা বদন আবৃত করিলাম। জাজালি কহিলেন, 'ভাই ইন্দ্রভূতি, তোমার কোনো অসামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমরণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছ কি? ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা কর, ব্রহ্মণ্যদেব তোমায় বল দিবেন, ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কঠিনতম চিত্তও সময়ে সময়ে বিষম ঝঞ্ঝায় আন্দোলিত হইয়া উঠে। সাবধানতা ও চেষ্টা আত্মরক্ষার বর্ম্ম। তুমি জ্ঞানী, তোমায় আমি অধিক কি বলিব?'

ছাই জ্ঞান! সে স্পর্দ্ধা টুটিয়াছে। রমণীর একটি ক্ষীণ দৃষ্টিরেখা আমার চিত্তের জ্ঞানাঙ্কিত পৃষ্ঠা একেবারে মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সেখানে আর কিছু নাই, শুধু কালী, শুধু অন্ধকার! না, না, ভুল বুঝিয়াছি; কুবলয়ার রূপজ্যোতিতে ঝলসিত নয়ন ক্ষণিকের জন্য অন্ধকার

দেখিতেছে, নতুবা, আছে আছে, সব আছে ; নরকের মধ্যেও ভোগবতীর প্রেমপ্লাবন প্রবাহিত হইতেছে।

জাজালি কহিতে লাগিলেন, 'আচার্য্যের আদেশ, কল্য প্রত্যুষে তোমাকে তপতী-তীরস্থ 'সারদাশ্রমে' যাইতে হইবে। সেই তোমার স্বাধীন জ্ঞানক্ষেত্র হইবে। তুমি প্রস্তুত থাকিবে। আমি সঙ্গে যাইয়া রাখিয়া আসিব।'

হা ভগবান, তোমার কি কঠিন বিচার! কুবলয়ার নিকট হইতে দূর দূর দূরান্তে আমার এই শোচনীয় জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে? সব শেষ হইয়া গেল? না, না, কুবলয়া যে এখন আমার মানসী, আমাদের বিরহ কে ঘটাইবে?

সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলাম। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্যাদি বন্ধন করিলাম। অযাচিত শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা কুবলয়ার স্বর্ণপেটিকা উত্তরীয়ে বাঁধিয়া বুকের উপরে ঝুলাইয়া লইলাম। অতি প্রত্যুষে জাজালি আমার দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার সহিত নির্গত হইলাম। আচার্য্যকে প্রণাম করিলাম। সতীর্থগণ আসিয়া আমায় আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনকালে আমার বুকে কঠিন স্বর্ণপেটিকা সকলেই অনুভব করিলেন, আমার মুখের দিকে বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে কেহ কোনো প্রশ্ন করিলেন না। আমরা বিদায় হইলাম।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা নগরে প্রবেশ করিলাম। নগর সুপ্ত-সিংহের মতো, প্রশান্ত জলধির মতো বিরাট গাম্ভীর্য্যে বড় সুন্দর। কেবল রক্ষিগণ ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মণগণ তমসায় স্নান করিতে যাইতেছেন। এক গৃহ হইতে শিশুর অস্ফুট কাকলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দেখিলাম, এক মাতা পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে দূরে ধরিতেছেন ; শিশু সেই চুম্বন-সুধার

মুহূর্ত্তপানে তৃপ্ত না হইয়া হাত পা নাড়িয়া, অস্ফুটভাবে কত কি বলিয়া প্রাণের ব্যগ্রতা জানাইতেছে; আবার মাতা হাসিয়া, একটি চুম্বন দিয়া, তাহাকে দূরে ধরিতেছেন; পার্শ্বে শিশুর পিতা অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় মাতাপুত্রের স্নেহপিপাসা দেখিয়া হাস্য করিতেছেন, তাঁহার এক হস্ত রমণীর কটিতে প্রেমের বেষ্টনী হইয়া আছে। মনে পড়িল—

"রথাঙ্গনাম্নোরিব ভাববন্ধনং
বভূব যৎ প্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্।
বিভক্তমপ্যেক সুতেন তৎতয়োঃ
পরস্পরস্যোপরি পর্য্যচীয়ত॥"

হিংসায় চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

ঐ যে আমার জন্মজন্মান্তরের চিরপরিচিত 'পারাবতভবন।' একটি গবাক্ষ খুলিয়া ঐ না আমার কুবলয়া! উষার আলোক-আঁধারে আমায় দেখিতে পাইতেছ কি? একটি দীর্ঘনিশ্বাস গবাক্ষ হইতে তপ্তলৌহ-পিণ্ডের মতো আমার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল। গবাক্ষ বন্ধ হইয়া গেল। জাজালি বলিলেন, 'পারাবত-ভবনে নৃত্যগীত, আলোক উৎসব কিছু নাই। আশ্চর্য্য!' আমার মনে হইতে লাগিল, আমার সম্মুখের গবাক্ষে কুবলয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মৌনভাষা যেন আমায় বলিতেছে, 'এস, এস, আমার আদর্শসুন্দর, আমার সকল ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন, তোমার চরণে অর্ঘ্য দিতেছি। লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়া উঠাইয়া লও হে, উঠাইয়া লও।' ভীরু আমি যন্ত্রচালিতের মতো জাজালির সহিত চলিয়া গেলাম। আমি কুবলয়ার সুপ্ত নারীত্ব জাগ্রত করিয়া দিয়াছি, আর কুবলয়া আমার প্রাণের সুপ্ত প্রেম জাগ্রত করিয়া দিয়াছে—কিন্তু আমি সেই প্রেমের অর্ঘ্য দিয়া তাহার নারীত্বের পূজা করিতে পারিলাম না। আমার প্রেম ও তাহার নারীত্ব নিষ্ফল বিলাপে হায় হায় করিতে লাগিল।

(২)

আমার নূতন আশ্রমে আসিয়াছি। আমিই এই আশ্রমের বর্ত্তমান আচার্য্য। আমার সম্বল গুটিকয়েক ছাত্র।

একদিন আশ্রমসন্নিহিত উদ্যানে আমি ভ্রমণ করিতেছি, দূরে দেখিলাম একটি রমণীমূর্ত্তি। ঐ ত আমার কুবলয়া! দৌড়িয়া ধরিতে গেলাম। সে একটা বৃক্ষের পশ্চাতে গেল, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। কেবল কোমল ঘাসের উপর তাহার পদচিহ্ন পড়িয়া আছে। আমি তাহার উপর বুক দিয়া পড়িলাম।

ক্ষণেক পরে, আমার এক শিষ্য আসিয়া বলিল, 'গুরুদেব, একটি রমণী আপনার সাক্ষাৎকামনা করিতেছে।' আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, কুবলয়ার সেই পেটিকাধারী পরিচারিকা। রমণীর মুখের দিকে চাহিতে সে বলিল, 'নিষ্ঠুর যুবক, ত্বদ্গতপ্রাণা কুবলয়া তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায়, এস, একবার শেষ দেখা দিয়া যাও।' আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, তাহার সহিত উন্মত্তের মতো ছুটিলাম। কত নদী বন, পর্ব্বত প্রান্তর, নিমিষে অতিক্রম করিতে লাগিলাম; পদ কাটিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, রক্তে পদ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। ঐ দেখা যায় পুলস্ত্যপুরী! চরণ অধিকতর দ্রুত চলিল। নগরের বহু পথ অতিক্রম করিয়া পারাবত-ভবনের উদ্যানপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিন্ধ্যগিরির একটি নির্ঝর কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্যান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; তাহাতে পদবিক্ষত শোণিত ধৌত করিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। অতিবৃহৎ অট্টালিকা জনশূন্য, আলোকশূন্য —মহাশ্মশানের মতো বিরাট ভয়ঙ্কর বোধ হইল। ত্রিতলে আসিলাম। একটি পরিচারিকা গলদশ্রুলোচনে বলিল, "বড় বিলম্ব করিয়াছ, নিষ্ঠুর ব্রহ্মচারী। কুবলয়া মরিয়াছে। তাহার শেষ শ্বাসে তোমারই নাম উচ্চারণ করিয়া সে মরিয়াছে।"

কুবলয়া মরিয়াছে! আমিই তবে তাহার মৃত্যুর কারণ! আমি পাষাণবৎ নিশ্চল; আমার গাঢ় শোকের বাহ্যবিকাশ বুঝি অসম্ভব। আমার পূর্ব্বপরিচিতা পরিচারিকা আমার হাত ধরিয়া আমাকে এক ঘরে লইয়া গেল। সেই ঘরে ছিল মৃত্যুসমাচ্ছন্ন কুবলয়া। একখানি অতি পাতলা গোলাপী রঙের কাপড় দিয়া কুবলয়ার দেহ আবৃত; পার্শ্বে একটা বড় বাতি কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছিল। আহা! কুবলয়ার সে কান্তি নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে প্রাণ নাই—তবু কত সুন্দর! ধরণীর সুপ্ত শোভার উপর উষার কোমলজ্যোতির আবরণে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে বস্ত্রাবৃত কুবলয়ার দেহে সেই সৌন্দর্য্য দেখিলাম। কুবলয়ার কেশে একটি গোলাপ সম্বদ্ধ রহিয়াছে,—তাহাতে একটি মাত্র পাপড়ি খসো খসো হইয়া আছে, বাকিগুলি শয্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। আমি ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গেলাম, পাছে কুবলয়ার সুখসুপ্তি টুটিয়া যায়। বহুক্ষণ তাহাকে দেখিলাম। কী সরল মুখশ্রী, কী প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি! কে বলে কুবলয়া কলঙ্কিনী ছিল? সে আজ প্রেমের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর ভিতর দিয়া অগ্নিতে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বলতর, পবিত্র হইতেও পবিত্রতর! কাতরকণ্ঠে বলিলাম, 'উঠ উঠ, প্রেয়সি! নয় ত তোমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া মরিবার অধিকার দেও।' আমি জানু পাতিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। আমি তাহার মৃত্যুমূক মুখের উপর চুম্বন করিলাম। অমনি কুবলয়া আমার কণ্ঠ বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, 'হে প্রিয় প্রেমিক, প্রেম মৃত্যুঞ্জয়! সম্বরণ প্রেমের বলে মৃত প্রেয়সী তপতীকে ফিরিয়া পাইয়াছিল। তোমার একাগ্র প্রেম আমার প্রাণে অমৃত নিষেক করিয়াছে। জরা, ব্যাধি, মরণ অন্তর্হিত হইয়াছে। হে আমার সর্ব্বমঙ্গলাশ্রয়, আমাদের উভয়ের হৃদয়ে যে প্রেমের গ্রন্থি পড়িয়াছে, তাহা ইহপরকালে খুলিবে না। হে সুন্দর, হে আমার আদর্শপুরুষ, তোমায় আমি না দেখিয়াই ভালো বাসিয়াছিলাম।

তোমায় আমি বহু স্থানে বহুদিন হইতে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। তোমায় আমি স্বপ্নে দেখিতাম, তোমায় আমি অনুভব করিতাম। তার পর সেই শুভ ও অশুভ দিনে তোমায় চাক্ষুষ দেখিলাম। সেই দিন তুমি আমার নিকটে আসিয়াও অতি দূরে চলিয়া গেলে,—তোমার আমার প্রাণের ব্যাকুলবিদ্রোহ লৌকিক দীক্ষা বারণ করিতে পারিল না। তাহাতে কী হইয়াছে? তোমায় ভালো বাসিয়া বুঝিয়াছি, দেহের মিলন মহামিলনের আবর্জ্জনা মাত্র। আমাদের জন্মজন্মান্তের মিলনের বিরহ ঘটায় এমন কে আছে? হে সুন্দর, তোমার অঙ্গ হইতে ছার কাষায় বস্ত্র টানিয়া ফেল। তুমি আমার হৃদয়ের অধিরাজা, এস রাজপরিচ্ছদে তোমায় সাজাইয়া দি।'

কুবলয়া আমার বেশ পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিতে লাগিল। আজন্ম বনবাসী আমি, প্রচুররূপে অনাবশ্যক পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিতে অনিবার্য্য ভুল করিয়া কুবলয়ার তীক্ষ্ণ মধুর হাস্যের কারণ হইতে লাগিলাম। অবশেষে কুবলয়া আমার সম্মুখে একখানি দর্পণ ধরিয়া বলিল, 'দেখ দেখি, আমি কী উচ্চ আদর্শের সুন্দর পুরুষ কল্পনা করিয়া আযৌবন হৃদয়ে রাখিয়াছি।'

উঃ, আমি এত সুন্দর! ব্রহ্মচারী আমি, কখনো নিজমূর্ত্তি না দেখিলেও আমার বিশ্বাস আমি কখনো এত সুন্দর নহি। কুবলয়ার প্রেমদৃষ্টিই আমাকে সুন্দরতর মধুরতর করিয়াছে। আমি কুবলয়াকে টানিয়া লইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম,—কুবলয়া আমাতে মিশিয়া গেল।

আমার সতীর্থ জাজালি ডাকিতেছেন, 'ইন্দ্রভূতি, ইন্দ্রভূতি'। আমি চমকিয়া দেখিলাম, জাজালি আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ডাকিতেছেন; শিষ্যমণ্ডলী চিন্তাকুল মুখে চারিদিকে দণ্ডায়মান। আমি বলিলাম, 'একি, কি হইয়াছে?' সকলের কথা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিলাম, আমি চারদিন যাবৎ অজ্ঞান ছিলাম। আশ্রমসন্নিহিত উদ্যানে অজ্ঞান হইয়া

পড়িয়া ছিলাম,শিষ্যগণ কুটীরে আনিয়া জাজালিকে ডাকিয়া আনিয়াছে। তখন আমার সকল কথা মনে পড়িল। আমি লজ্জিত হইয়া জাজালির সহিত অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে জাজালি বলিলেন, 'রাজনর্ত্তকী কুবলয়ার চারিদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। কি এক অজ্ঞাত চিন্তায় নির্জ্জনবাসে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সে মৃত্যুলাভ করিয়াছে। রাজা পর্য্যন্ত তাহার প্রাসাদে প্রবেশলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তাহার হঠাৎ ধর্ম্মভাব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি আমাদের ও অন্যান্য আশ্রমকে, এবং পারাবত-ভবন তোমার আশ্রমকে দিয়া গিয়াছে। সে মৃত্যুকালে নাকি বলিয়াছিল, নিষ্ঠুর যুবক, আমার পূজা এজন্মে গ্রহণ করিলে না, পরজন্মে গ্রহণ করিতে হইবে। কুবলয়ার প্রাণময় প্রেম, ব্যর্থ হইবে না!' এই কথা শুনিবামাত্র আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম জানি না। জ্ঞান লাভ করিয়া দেখিলাম, আমি আচার্য্যের আশ্রমে আসিয়াছি। আমার বুকের ধন স্বর্ণপেটিকাটি সর্ব্বসমক্ষে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে; চিত্রগতা কুবলয়াকে দেখিয়া লজ্জা ও শোকে আমার চক্ষু বাহিয়া জল পড়িল। আচার্য্য নিষ্ঠুর নিয়তির মতো বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, 'বৎস ইন্দ্রভূতি, ঐ স্বর্ণপেটিকা তমসার জলে নিক্ষেপ করিয়া আইস। 'পারাবত-ভবন' ভগ্ন করিয়া দেবমন্দির নির্ম্মিত হইবে। সে ভারও তোমার উপর।'

আচার্য্যের আদেশের দ্বিরুক্তি করা আমার সাধ্যাতীত। আমি তো আমার সুখ নিজহাতে তমসার জলে নিক্ষেপ করিতে চলিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি কি নিষ্ঠুর! মানবহৃদয়ের কোমলতা, দয়া, মমতা কি তোমাতে নাই? পেটিকা তমসাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল। কুবলয়ার বাসভবন আমার চক্ষের সমক্ষে আমারই আজ্ঞায় ভগ্ন হইতে লাগিল। গৃহের এক-একখানি ইষ্টক প্রস্তর আমারই শরীরের অস্থিগুলির মতো খসিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সব শেষ হইয়া গেল।

তৎপরে সেখানে নির্ম্মিত হইল এক উচ্চচূড় মন্দির,—এবং তাহাতে স্থাপিত হইল এক সরস্বতীমূর্ত্তি।

তখন আচার্য্য আদেশ করিলেন, আমাকে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতে হইবে। সহিষ্ণুতার সীমা আছে; আমার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া বলিলাম, 'আমার চিত্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, আপনার শ্রীচরণ হইতে দূরে পাঠাইবেন না।' এ কথায় ছল ছিল কি না ঠিক বলিতে পারি না। আমার অনুনয়ে আচার্য্য সদয় হইয়া সরস্বতীমন্দিরে আমার স্বাধীন আশ্রম করিতে আদেশ দিলেন।

আমার নিকট কুবলয়া মরিতে পারিল না। জগতের প্রতি-সৌন্দর্য্য-কণায় তাহারই রূপের ছায়া দেখিতাম। দেখিতাম, সমগ্র রমণীসমাজ মাতৃত্বে স্বসৃত্বে দুহিতৃত্বে কুবলয়ার প্রেমের অনুকরণ করিতেছে। কুবলয়াকে ভালোবাসিয়াছিলাম বলিয়া আমার নীরস কঠোর প্রাণ বিশ্ব-সংসারকে প্রেম দিতে শিখিল। একের ভালোবাসা বহুতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতি রাত্রিতে মন্দির 'পারাবত-ভবনে' পরিণত হইত, আর সরস্বতী হইত আমার কুবলয়া। তাহার বীণা হইতে প্রণয়গীতি ধ্বনিত হইত, তাহার হস্তের পুস্তকে প্রেমানুপ্রাণিত শ্লোক পাঠ করিতাম। সে আমায় নিত্য নূতন জ্ঞানরত্নের অধিকারী করিত, নিত্য নূতন ললিত-কলায় অভিজ্ঞতা দিত। সরস্বতী আমার প্রেমপ্রাণা জ্ঞানদাত্রী কুবলয়া, আমি তাহার নিত্য-উপাসক ইন্দ্রভূতি। ভোরের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে কুবলয়া পাষাণী হইয়া পাষাণবেদিকায় উঠিয়া বসিয়া খালি হাসিত, আমি তাহার দীনভক্ত সমস্ত দিন তাহার পদতলে বসিয়া নানাশাস্ত্রের আলোচনা করিতাম। আজও, আমি সেইরূপ দিনে নানাশাস্ত্রপারদর্শী অধ্যাপক ব্রহ্মচারী পরসেবারত, রাত্রে আমি কুবলয়ার প্রেমকুশলী দীন উপাসক। ইহা—"স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু?"।

বন্ধু

বীরেন্দ্রের দাদার বিবাহ। বীরেন্দ্র তাহার বরযাত্র। দাদার ভার লইয়া যখন প্রজাপতি ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন ভায়ার ভারটা পড়িয়াছিল মনোভবের উপর।

বিবাহ হইতেছে। বীরেন্দ্র এক পাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কন্যা-সম্প্রদান দেখিতেছিল, আর দেখিতেছিল একটি তরুণী একখানি ফুলের পাখা লইয়া কি লীলার সহিত বরকনেকে বাতাস করিতেছে।

তরুণীটি পাতলা ছিপছিপে, দেহ-লতা যেন ফুলের পাখার বাতাসে দুলিয়া উঠিতেছে; মুখখানি ঢলঢলে, চোখদুটি টানা-টানা টলটলে, বর্ণটি স্নিগ্ধ সুগৌর, গড়নটি কল্পনার মতো অপরূপ। বীরেন্দ্র অবাক হইয়া ইহাকেই দেখিতেছিল।

তরুণীটিও বুঝিতেছিল কে একটা লোক ঘরের এক কোণ হইতে কেমন অসভ্যের মতো তাহারই দিকে হাঁ করিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। সেই অপরিচিতের দৃষ্টির আঘাতে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু তাহার একটু কৌতুকও বোধ হইতেছিল, লোকটা এত লোক থাকিতে তাহাকেই বা অমন করিয়া একদৃষ্টে গিলিতেছে কেন।

তরুণী বাতাস করিতে করিতে তাহার টানা চোখের অপাঙ্গে যতবার বীরেন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল, ততবারই তাহাদের চার চোখের মিলন হইতেছিল। আর অমনি দ্বিগুণ সঙ্কোচে সে তাহার চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছিল, লজ্জারুণ হাসির রেখা তাহার অধরখানিকে রাঙাইয়া তুলিতেছিল—তাহা যেন স্ফটিকপাত্রে মদিরা—বীরেন্দ্রকে উপহার।

চক্ষু ফিরাইয়া পরমুহূর্তে মনে হইতেছিল লোকটা এখন কি করিতেছে

—এখনো তেমনি করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে কি? অমনি অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি ঘরের সেই কোণটার দিকেই অভিসার করিতেছিল যে কোণটায় একটা কে অজানা লোক কেবল তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

বিবাহ হইয়া গেল। বরকনে বাসর-ঘরে। তরুণী উঠিয়া গিয়াই দূর হইতে বীরেন্দ্রকে দেখাইয়া তাহার এক সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ ভাই, ঐ লোকটি কে জানিস?"

সঙ্গিনী বলিল, "না। কেন?"

তরুণী অকারণে লজ্জিত হইয়া বলিল "না, অমনি।" সেই অজানা লোকটির অসভ্যতার পরিচয় সঙ্গিনীর কাছে কিছুতেই ব্যক্ত করা গেল না।

লোকটা কে জানিবার জন্য কিন্তু তাহার কৌতূহল তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তরুণী শত কাজের ছলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বীরেন্দ্রকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিল,—পরিচয় জানিবার আগে লোকটা ভিড়ের ভিতর হারাইয়া না যায়।

বরযাত্রদের খাওয়া হইয়া গেলে তরুণী দেখিল সেই লোকটি দিব্য সপ্রতিভভাবে তাহারই নিকটে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। তরুণী লজ্জায় লাল হইয়া পলায়নের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় তাহার মিনতিস্বর কানে গেল "আমায় একটু বাসর-ঘরে নিয়ে চলুন না।"

তরুণী ভাবিল বাড়ীতে এত লোক থাকিতে আমাকে এ অনুরোধ কেন? সে লজ্জায় আরো লাল হইয়া উঠিল। কষ্টে একটি ছোট্ট "আসুন" বলিয়া বীরেন্দ্রের আগে আগে বাসর-ঘরের পথ দেখাইয়া চলিল।

বীরেন্দ্র বাসর-ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল "দাদা।"

বর বলিল "কে রে, বীরেন? কি বলছিস?"

"আমি বাড়ী যাচ্ছি তাই বলতে এলেছি।"

"কাল সকালে আবার আসিস্।"

"আসব।"

যাইবার কালে বীরেন একবার কাহার সন্ধানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল। তাহার পথপ্রদর্শিকা তখন কনের পাশে গিয়া বসিয়া হাসিতেছে; বীরেন্দ্রকে পুনরায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনো আগ্রহ তাহার দেখা গেল না। অগত্যা অসহায় বীরেন্দ্র একাই কোনো মতে পথ করিয়া বাহিরে গেল।

বীরেন্দ্র দাদার কাছে বিদায় লইয়া আসিল বটে কিন্তু বাড়ী যাইবার জন্য তাহার কোনোই আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। অকস্মাৎ তাহার খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকল পরিচিতের সহিত আলাপ করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু সে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপেই রত থাকিতে পারিতেছিল না, তাহার চক্ষু কাহার শেষ দর্শনের আশায় ঘন ঘন চারিদিকে চাহিতেছিল।

একটু পরেই সেই তরুণীটি বীরেন্দ্রের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। সে আজ ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; একবার ভাঁড়ার ঘরে, একবার বাসর-ঘরে, একবার উঠানে, একবার দালানে বড় ঘন ঘন গতায়াত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যস্ত হইবারই তো কথা, কাজের বাড়ীতে কাজের লোক কিনা!

রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতগণ যে যার ঘরে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বীরেন্দ্রের আর থাকা চলে না। এদিকে আবার একটি বালক নিদ্রালস কাতর কণ্ঠে বলিতেছিল "বীরেন-কা, তুমি বাড়ী যাবে কখন?"

বীরেন বালককে কথায় বলিল "চল্ এইবার যাই।" কিন্তু চক্ষু আর কাহার কাছে মৌন ভাষায় ব্যাকুল বিদায় প্রার্থনা করিল। তরুণী ঘাড় হেঁট করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া কেবলি মনে করিতে লাগিল "কেমন সুন্দর মেয়েটি! মেয়েটি কে?" বিবাহ-বাড়ীতে কত দিগ্‌দেশের নিমন্ত্রিত এক রাত্রির জন্য মিলিত হইয়া পুনরায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আর তাহার সহিত কখনো সাক্ষাৎ হইবে কি না কে জানে? না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তবু বীরেন্দ্রের বিনিদ্র রজনী সেই অজানার ধ্যানেই প্রভাত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি তাহার মনের মধ্যে বার বার গুঞ্জন করিয়া উঠিতেছিল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

প্রভাতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি বীরেন্দ্র দাদার শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল। বাড়ীর চৌকাঠ পার হইতেই তাহার অন্তর আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যদি তাহার দেখা পাই? যদি না পাই?

বীরেন্দ্র বৈঠকখানায় গিয়া বসিল, তাহার চিত্তটি কিন্তু বারবার অন্তঃপুরের দিকে উঁকি মারিতেছিল। সেই তরুণীটি এবাড়ীতে নাই, তাহার সহিত আর দেখা হইবে না, ইহা জানিলেও যেন সে নিশ্চিন্ত হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

বেলা হইল। বরকনেকে বিদায় দিবার আয়োজনে সকলে ব্যস্ত। বিদায়ের ক্ষণ যত ঘনিষ্ঠ হইতেছে বীরেন্দ্রের চিত্তও তত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

বীরেন্দ্রকে কিছু মিষ্টমুখ করিয়া যাইতে হইবে—একবার গা তুলিয়া বাড়ীর ভিতর যাইতে হয়। বীরেন্দ্রের বুক আনন্দ-উদ্বেগ-আশঙ্কায় ধড়াস করিয়া উঠিল।

"না না, তাও কি হয়, এত সকালে" ইত্যাদি মামুলি অকিঞ্চিৎকর

ওজর অগ্রাহ্য হওয়ায় বীরেন্দ্র যেন অগত্যা অন্দরে চলিল। তাহার অন্তর কিন্তু তখন তোলপাড় করিতেছিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই বীরেন্দ্রের দাদার শাশুড়ী বলিলেন, "এস বাবা এস। তুমি ঘরের ছেলে, অমন পরের মতন বাইরে বসে' ছিলে কেন। এস, এই ঘরে এস।"

সেই ঘরে বরকনে বসিয়া ছিল। আর ছিল বসিয়া আর একজন—যাহার দর্শনলালসায় বীরেন্দ্রের চিত্ত উৎসুক পর্য্যাকুল—সেই তরুণী।

বীরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেই সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। চার চোখে এক হইতেই বীরেন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তরুণীও স্মিতমুখ নত করিল।

বীরেন কার্পেটের এক প্রান্তে বসিল। তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। গিন্নি তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বলিলেন "মা সুকু, বীরেনকে একটু জলখাবার এনে দে না মা।"

সুকু আর একবার বীরেনের দিকে চকিত চাহনি হানিয়া চলিয়া গেল। বীরেন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, তবু সে-দৃষ্টি তাহার অদেখা রহিল না।

অল্পক্ষণ পরে এক রেকাব ফল মিষ্টান্ন ও এক গেলাস জল লইয়া সুকু অবনত হইয়া বীরেনের কোলের কাছে রাখিল।

এত নিকটে! বুঝি বা উভয়ে উভয়ের হৃৎস্পন্দন শুনিতে পাইয়াছিল। উভয়ে কেন লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সুকু সোজা হইয়া দাঁড়াইবামাত্র বীরেন চোখ তুলিয়া চাহিল। আবার চার চোখের মিলন! তরুণীর তরল চাহনি চঞ্চল ও বীরেনের মুখ হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তরুণী সাবলীল চঞ্চলতার সহিত বীরেনের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

বীরেন খাইতেছিল আর তাহার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছিল—সুকু! সুকু!—সুকু কোন নামের অপভ্রংশ? সুকুমারী—সুখময়ী—না কি?

নিশ্চয় এ ইহাদের আত্মীয়। বৌদিদির কাছে পরিচয়টা জানিয়া লইতে পারিবে বলিয়া বীরেন কতকটা আশ্বস্ত হইল।

বরকনে বিদায় লইল। রোরুদ্যমানা বধূকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে গেল স্মিতাননা স্কু। বীরেনের সঙ্গে আবার তাহার চক্ষুর মিলন হইল। মনোভবের কারসাজি!

বাড়ীতে ফিরিয়াই বীরেন বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বিমনা বধূকে ঘিরিয়া যত রাজ্যের মেয়েরা বকিতেছে হাসিতেছে, বীরেন আর আলাপ করিবার অবকাশ পায় না।

বীরেন বারবার কাজের ছুতা করিয়া বৌদিদির কাছে যায়, ছল খুঁজিয়া কথা বলে, বৌদিদির কি দরকার বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া জোগায়। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় বৌদিদিকে একটু নিরিবিলি পাইয়া বীরেন তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল "বৌদি, চিরকালের চেনা ঘর ছেড়ে অপরিচিতের রাজ্যে এসে ভারি মন কেমন করছে, না? কিছুদিন পরে কিন্তু এই অচেনা ঘর ছেড়ে চেনা ঘরে গিয়ে তিষ্ঠতে পারবে না।"

বৌদিদির মুখখানি দুঃখবিমলিন থাকা সত্ত্বেও বীরেন্দ্রের কথায় লজ্জারুণ হইয়া ভারি সুন্দর দেখাইল। একটু হাসিয়া বীরেন্দ্রের দিকে একটু সকৌতুক কটাক্ষ হানিয়া বলিল "ইস! তাই বৈ কি!

বীরেন হাসিতে হাসিতে বলিল "দেখে নিয়ো তখন—আমি কেমন গণৎকার, আর আমার দাদাটি কেমন জাদুকর।"

"যাও!" বলিয়া হাসিয়া বৌদি ঘাড় হেঁট করিল।

এইরূপে অল্পে অল্পে লজ্জার আবরণ অপসারণ করিয়া উভয়ের আলাপ জমিয়া উঠিল।

তখন বীরেন প্রশ্ন করিল, "বৌদি, তোমরা ক বোন?"

"আমার আর বোন নেই।"

বীরেন সমস্ত হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া বলিল "তবে সেই যাকে তোমার মা সুকু বল্লেন সে কে?" এই সহজ কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বীরেনের গলা কেন কাঁপিয়া গেল, বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

বৌদিদি বলিল "সে আমার পিসতুতো বোন। তার মা বাপ নেই, সে আমাদের বাড়ীতেই থাকে।"

"তার পুরো নামটি কি বৌদিদি? সুকুমারী?"

"হ্যাঁ।"

"ওর বিয়ে হয়েছে?"

বৌদিদি হাসিয়া বলিল "না। কিন্তু তোমার কোনো আশা নেই, সে তোমার স্বগোত্তর।" বৌদিদির মুখের উপর দিয়া একটা দুষ্ট কৌতুকের হাসি বিজলি হানিয়া গেল।

বৌদিদির স্বাভাবিক রসিকতাটুকু বীরেন্দ্র বেশ সহজে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে কেমনতর গম্ভীর হইয়া গেল। হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল "বৌদি, তুমি বস, আমি তোমায় কতকগুলো বই এনে দি, যখন একলা থাকবে পড়বে।"

বীরেন্দ্র আপনার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার অন্তরের মধ্যে তাহার বৌদিদির কথার অনুরণন হইতেছিল—"তোমার কোনো আশা নেই।"

আশা যখন নাই তখন বীরেন্দ্র আপনাকে সংবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টাই কাল হইল। জাগ্রত প্রহরায় তাহার অন্তর হইতে সুকুমারীর স্মৃতি অপসৃত হইবার অবসরই পাইল না।

অষ্টাহ পরে বধূ পিত্রালয়ে ফিরিয়া গেল, সঙ্গে গেল বীরেন্দ্র। আবার সুকুমারীর সঙ্গে তাহার চোখোচোখি হইল। সুকুমারী হাসিল। বীরেন্দ্র হাসিতে পারিল না, তাহার প্রাণের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিতেছিল।

বীরেন্দ্রের আগমনে সুকুমারী ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তাহার দিদি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "আরে পালাস কোথায়? ঠাকুরপোকে দেখে আবার লজ্জা! তুই ঠাকুরপোর সঙ্গে ততক্ষণ কথা বল, আমি বাবার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

একলা একঘরে বীরেন্দ্র আর সুকুমারী। বিধাতার পরিহাস! কিন্তু তাহারা কি যে কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সুকুমারী লজ্জানত মুখে নখ খুঁটিতে লাগিল, বীরেন আঙুলে রুমাল জড়াইয়া জড়াইয়া খুলিয়া আবার জড়াইতে লাগিল। তাহাদের অনেক কথা বলিবার ছিল বলিয়া একটা কথাও বলা হইল না।

একঘরে দুটি মানুষ—অথচ কোনো বাক্যালাপ নাই। এরকম অবস্থায় থাকা অস্বস্তিকর ও লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তখন যা-হোক-একটা-কাজে নিজেদের ব্যাপৃত করিবার জন্য সুকুমারী একথালা জলখাবার আনিয়া বীরেনের কোলের কাছে রাখিল। বীরেন কিছু না বলিয়া শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, খাবারে হাত দিল না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সুকুমারী যখন দেখিল বীরেন খায় না, তখন সে মৃদু স্বরে একটি ছোট কথা বলিয়া ফেলিল—"খান।"

বীরেন হাসিয়া বলিল "ও! আমায় খেতে দিয়েছেন বুঝি।"

এই কথায় সুকুমারী ভারি কৌতুক অনুভব করিয়া ব'লল "আপনি কি মনে করেছিলেন?"

বীরেন বলিল "আপনি ত কিছু বল্লেন না, আমি মনে করলাম ওগুলো আপনি নিজে খাবেন বলে নিয়ে এলেন বুঝি!"

সুকুমারী পরাজিত হইয়া বলিল "দূর!"

যাহাদের অন্তরের পরিচয় হইয়া গেছে, তাহাদের লৌকিক সঙ্কোচের বাঁধ একবার ভাঙিলে হয়, তখন ভাবের প্রবাহ রোধ করা দায় হইয়া

উঠে। তাহাতে আবার ইহাদের ঠাট্টার সম্পর্ক। শীঘ্রই আলাপ জমিয়া উঠিল।

নববধূ এখন খুব ঘন ঘন বাপের বাড়ী হইতে শ্বশুরবাড়ী ও শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী গতায়াত করিয়া নূতন বাড়ীর সহিত পরিচয় ও পরগৃহবাস অভ্যাস করিতেছে। এক বাড়ী হইতে আর এক বাড়ীতে রাখিতে যাওয়া ও লইয়া আসা বীরেনের ভার। বীরেন পরম উৎসাহের সহিত আপন কর্ত্তব্য পালন করে।

এইরূপ গতায়াতে অল্পে অল্পে নিজেদের অজ্ঞাতসারে বীরেন্দ্র সুকুমারী খুব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বড় মেয়েকে নাম ধরিয়া ডাকিতে সঙ্কোচ হয়। বীরেন্দ্র একদিন বলিল "আপনার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক পাতাতে হচ্চে। আপনাকে কি বলে ডাকি?"

বৌদিদি বলিল "ঠাকুরপো, তুমি আমায় বল 'তুমি', আর আমার বোনকে বল 'আপনি'। বেশ ত!"

বীরেন হাসিয়া বলিল "তুমি আমার বৌদি, তোমায় 'তুমি' বলা সাজে। ওঁকে তুমি বলি কোন সম্পর্কে?"

"ওকে 'তুমি' বোলো বন্ধু সম্পর্কে। ও তোমার বন্ধু। কেমন?"

বীরেন উৎসাহিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ ঠিক ঠিক। উনি আমার বন্ধু।"

বীরেন্দ্রের উৎসাহ সুকুমারীকে লজ্জিত করিয়া তুলিল।

অল্পে অল্পে এই বন্ধুত্বও সহজ হইয়া আসিল। তাহাদের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর হইয়া ক্রমে ক্রমে আসক্তি এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে, বীরেন্দ্রকে একদিন না দেখিতে পাইলে সুকুমারী বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, সুকুমারীকে একদিন না দেখিলে বীরেন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠে। রোজ রোজ কুটুম্ববাড়ী যাওয়াও যায় না। ছলছুতা খুঁজিয়া কিংবা খুব দেরি করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু প্রাণ ছটফট করিয়া সারা হয়। বীরেন্দ্র যেদিন দেখা করিতে যায়, সুকুমারী জিজ্ঞাসা করে "আবার কবে আসবে?"

বীরেন্দ্রের অন্তর বলিতে চাহে "কাল।" কিন্তু জোর করিয়া মুখে বলে "সেই শুক্রবার।" সুকুমারী আনমনে বলে "শু-ক্রু-র বা-র!" তারপর সেই শুক্রবারের প্রতীক্ষায় উভয়ের যে যাতনা সহ্য করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারিবে না।

কিছুদিন পরে সুকুমারীর জ্বর হইল। বীরেন্দ্রের ইচ্ছা করিত সে রাতদিন তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া ঔষধপথ্য জোগাইয়া তাহাকে আনন্দিত রাখে। কিন্তু কেমন বাধো বাধো বোধ হইত বলিয়া পারিত না। দুতিন দিন পরে বৌদিদি বলিল "ঠাকুরপো, সুকুকে একটা কিছু ওষুধ দেও। তুমি বাড়ীর ডাক্তার থাকতে বাইরের ডাক্তার ডাকি কেন।"

বীরেন্দ্র প্রাণপণ উৎসাহে সুকুমারীর চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিল। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতে বসিয়া রোগীর হাতখানি ডাক্তারের মুঠির মধ্যে বড় বেশি বিলম্ব করিত; ডাক্তারের আঙুল কটি যখন রোগীর শিরাধমনীর উপর সঞ্চালিত হইত তখন রোগীর অন্তর-বীণার তারগুলি যেন বাজিয়া উঠিত; ডাক্তার টিংচার কোলোরোফর্ম ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে রোগী ও ডাক্তার উভয়ের প্রাণের উপর কোলোরোফর্ম্মের আবেশ বিস্তৃত হইয়া পড়িত। ডাক্তার প্রেসক্রপসন লিখিতে গিয়া আনমনে লিখিয়া ফেলিত—

"আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"

এই ব্যবস্থা রোগীর কাছেও পরম রসায়ন বলিয়াই বোধ হইত।

এমন সব সুচিকিৎসার গুণে রোগী শীঘ্র সারিয়া উঠিল। ডাক্তারের ঘনঘন আসার আর আবশ্যক রহিল না।

অনেকদিন পরে একদিন বীরেন্দ্র বৌদিদিকে বাপের বাড়ী রাখিতে গিয়াছে। বীরেন সুকুমারী একলা বসিয়া গল্প করিতেছে। হঠাৎ বীরেন্দ্র বলিল "দেখ বন্ধু, শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—কিন্তু আমার সঙ্গে নয়—এটা ঠিক। যার সঙ্গেই হোক আমি কিন্তু চিরদিন তোমার বন্ধু থাকব। তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে ত।"

সুকুমারী হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

বীরেন্দ্র ও সুকুমারীর মিলন দুর্ঘট বলিয়াই প্রণয় ক্রমে ক্রমে খুব প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বীরেন্দ্রের বৌদিদি আজকাল প্রণয়-ব্যাপারে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিল; সে সব বুঝিতে পারিল। একদিন সুকুমারীকে বলিল "হাঁলো, এমনি করেই কি আত্মহত্যা করতে হয়?"

সুকুমারী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার দিদি তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। তাহারও অশ্রু ঝরিয়া পাড়তেছিল।

সুকুমারীর বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছিল। তাহার দিদি একদিন বাবাকে বলিল "বাবা, বীরেন ঠাকুরপোর সঙ্গে সুকুর বিয়ে দিলে হয় না?"

"সগোত্রে কি বিয়ে হয় রে পাগলি?"

"কেন? ঐ যে পরিতোষদার হয়েছে!"

"তারা যে ব্রাহ্ম।"

"আমাদের কি কোনো মতে হতে পারে না।"

"না। তা কি হয়।"

"হলে কিন্তু বেশ হত।"

"তা ত বুঝি, দুটি বোনে তোরা এক জায়গায় থাকতিস্। কিন্তু তা যে হবার জো নেই।"

বৌদিদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্থান করিল। মনোভব যখন

মিলনের ভার লয় আমাদের দেশের প্রজাপতি তখন এত করিয়া বাদ সাধে কেন ?

সুকুমারীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

তার পর একদিন বীরেন বেড়াইতে আসিয়াছে। সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিল "বন্ধু, তোমার জন্যে একটা আনন্দ-সংবাদ আছে।"

বীরেন অতিমাত্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "কি বন্ধু, কি ?"

সুকুমারী বলিল "আমার বিয়ে !"

তাহার দিদি ভ্রূকুটি হানিয়া বলিল "মর পোড়ারমুখী! সব তাতেই রঙ্গ !"

সুকুমারীর চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। মুখে জোর করিয়া হাসিয়া বলিল "বা রে! আমার বিয়ে, আমার বন্ধুকে এমন আনন্দ-সংবাদ দেবো না ?"

বীরেন্দ্রও গূঢ় অন্তর্বেদনাটাকে লঘু করিয়া ফেলিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জোর করিয়া হাসিয়া উৎসাহ দেখাইয়া বলিল "কবে বন্ধু, কবে ?" কথা বলিতে কিন্তু গলা কাঁপিয়া গেল।

সুকুমারী কটাক্ষ হানিয়া হাসিয়া বলিল "নেমন্তন্ন হবেই, টেরও পাবে।"

বৌদিদি সুকুমারীর দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টি হানিল কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষুর ভর্ৎসনা চোখের জলে গলিয়া পড়িল।

সহানুভূতির স্পর্শে সুকুমারীরও রুদ্ধ বেদনার বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সে দিদির কোলে মুখ লুকাইল। বীরেন্দ্র আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যাহার সহিত সুকুমারীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহার নাম সন্তোষ। সে এইবার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছে। সে বীরেন্দ্রেরই সহপাঠী।

বহুকাল হইতে বীরেন্দ্রের সহিত সন্তোষের দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। বীরেন্দ্র হঠাৎ তাহার সহিত পত্রপ্রসঙ্গে পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালাইয়া লইল।

সন্তোষ বিবাহ করিতে কলিকাতায় আসিল। বীরেন্দ্র তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সন্তোষ বলিল "ওহে বীরেন, শুনেছ, আমার বিয়ে।"

বীরেন হাসিয়া বলিল "কবে হে, কোথায় ?"

"এই ভবানীপুরের রমেশ উকিলের বাড়ী। আর শনিবার বিয়ে। তোমায় বরযাত্র যেতে হবে কিন্তু, এখন থেকে বলে রাখছি।"

"নিশ্চয় যাব। কনে দেখেছ ?"

"তা আর দেখিনি ?"

"কেমন ?"

"A veritable Rosalind is she !

'By heavenly synod was devis'd.

Heaven would she many gifts should have,

And I to live and die her slave !'"

বীরেন হাসিয়া বলিল "সত্যি নাকি কবি! শুধু দর্শনেই এই! আলাপ হলে যে একেবারে Orlandoর মতো লণ্ডভণ্ড অবস্থা হবে সেটা বেশ বুঝতে পার্‌ছি।"

সন্তোষও হাসিয়া বীরেনের কাঁধ ধরিয়া একটা নাড়া দিয়া বলিল "প্রেমতত্ত্ব তুমি কি বুঝবে ভায়া! শুধু যত রাজ্যের মরা heart dissection করে মরেছ, জ্যান্ত heart নিয়ে ত নাড়াচাড়া করনি। যখন করবে, বুঝবে হে বুঝবে।"

"থাক ভাই তোমার বোঝা তোমার ঘাড়ে। আমার বোঝার দরকার নেই। তোমার যেমন কাহিল অবস্থা দেখছি,—তোমার বন্ধু আমি, তোমার প্রেয়সীকে কি উপহার দেবো বল ত—a heart pierced through and through by an arrow—কেমন ?"

বীরেনের পিঠ চাপড়াইয়া সন্তোষ বলিল "Bravo! a capital poetic idea!"

বীরেন বাড়ী ফিরিয়া বলিল "বৌদি আর শনিবার সুকুর বিয়ে!"

বৌদিদি কাতর দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "কে বল্লে?"

"স্বয়ং বর নিজে।"

"সে কি! তার সঙ্গে আবার তোমার কোথায় আলাপ হ'ল?"

"সে আমার সহপাঠী বৌদি।"

"সে কি জানে তুমি সুকুমারীর—পরিচিত?"

"না বৌদি, এখনো সে তত্ত্ব ফাঁস করিনি। বিয়ের পর তাকে surprise করতে হবে। জানো বৌদি—বিয়ের সময় সুকুকে কি উপহার দেবো ঠিক করেছি?"

"না। কি?"

"একটা ব্রুচ—একটা বাণবিদ্ধ হৃদয়! কেমন বৌদি, ঠিক হবে না।"

"দূর! তোমাদের সকল তাতেই রঙ্গ! নিজের দুঃখটাকেও রেহাই দেও না।"

"রেহাই দি না বলেই ত টিঁকে আছি বৌদি। নইলে, যদি মলিনমুখে দিবানিশি শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল নিয়ে থাক্‌তাম তা হলে লোকে আমাদের পাগল ভাবত কিনা বল ত? দুঃখের ওপর অপমান—সেটা কিছুতেই লোভনীয় অবস্থা নয় বৌদি।"

"বিয়ের দিন যাবে?"

"যাব না বৌদি, তুমি কী বল? সন্তোষ নেমন্তন্ন করেছে, সুকু করবে, তুমিও করবে—"

"না, আমি করব না। বারণ করব। সুকুকেও বারণ করতে বলব।"

"না না, বৌদি, সে কি হয়? আমায় যেতেই হবে। আমি যে বরযাত্র।"

"চোখের সামনে দেখতে পারবে?"

"হ্যাঁ বৌদি, বেশ পারব। যে আত্মহত্যা করতে উদ্যত তার খুনেকে কিসের ভয় বৌদি?"

বৌদিদি আর কোনো কথা বলিতে পারিল না।

বিয়ের সব ঠিকঠাক। বীরেন বৌদিদিকে বিয়ে-বাড়ীতে রাখিতে গেল। সুকুমারী আসিয়া হাসিয়া বলিল "বন্ধু,—এই শনিবার!"

বীরেন হাসিয়া বলিল "জানি হে বন্ধু, জানি।"

"কোথায় এর মধ্যে খবর পেলে।"

"কেন, তোমার বিয়ের খবরটা যেন তোমারই একান্ত নিজস্ব, আর কারো যেন সে খবর রাখতে নেই।"

"না, সত্যি বল না, কোথায় টের পেলে?"

"কেন, সন্তোষের কাছে।"

"ওমা, এর মধ্যে সেদিকটাও আগলাতে আরম্ভ করেছ বুঝি! সেখানে জুটলে কেমন করে?"

"তুমি একেবারে অজানার কাছে গিয়ে জুটতে পার, আর আমি বুঝি আমার সহপাঠীর কাছে জুটতে পারিনে।"

"ও!—সন্তোষ বাবু বুঝি তোমার সহপাঠী!"

"সন্তোষ বাবু কিরে বেহায়া মেয়ে! স্বামিন্, প্রভু, হৃদয়েশ্বর!"

"প্রথম ছুটো, শেষটা নয়।" বলিয়া সুকুমারী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শনিবার। আজ সুকুমারীর বিবাহ। বীরেন্দ্র আবার বরযাত্র

আসিয়াছে। দাদার বিবাহে বরযাত্র আসিয়া বীরেন সুকুমারীর হৃদয় জয় করিয়াছিল; আজ সুকুমারীর বিবাহে বরযাত্র আসিয়া সে নিজের পরাজয় দেখিতেছে। সেই ঘরের সেই জায়গাটিতে—যেখানে এক বৎসর পূর্ব্বে সুকুমারী ফুলের পাখা লইয়া দিদির বিবাহ দেখিয়াছিল ঠিক সেইখানে—আজ এক বৎসর পরে সুকুমারী ফুলের গহনা পরিয়া বধূবেশে বসিয়া আছে। আর আজও সেই কোণটিতে দাঁড়াইয়া আছে বীরেন যে কোণ হইতে সে সুকুমারীর সহিত শুভদৃষ্টি করিয়াছিল। আজ সে সুপরিচিত হইয়াও দূরে চলিয়া যাইতেছে, অপর একজন অজানা আজ সুকুমারীর নিকট জীবন মরণের পরিচয় স্থাপন করিতে আসিয়াছে। সুকুমারী আজও তেমনি ব্রীড়াবনত মুখ যখনই তুলিতেছিল তখনই অপাঙ্গে দেখিতেছিল বীরেন বুকের উপর হাতদুখানা শৃঙ্খলিত করিয়া অনিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, গম্ভীর ভাবে তাহারই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। প্রজাপতির পরিহাস!

বিবাহ হইয়া গেল। বরকনে বাসর-ঘরে। আজ আর বীরেনকে বাসর-ঘরে পথ দেখাইয়া লইবার জন্য কোনো উৎসুক হৃদয় ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছে না। এত লোকের মধ্যেও বীরেন আজ একা। সে সকলের অজ্ঞাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। অসংখ্য জনতার মধ্যে কেবলমাত্র একজন ব্যথিত চিত্তে বীরেন্দ্রের খোঁজ করিতেছিল—সে তাহার বৌদিদি।

বিবাহের পর বীরেন্দ্র আর সন্তোষের বাড়ী যায় নাই। সন্তোষ বীরেন্দ্রের বাড়ী গিয়া বলিল "কি হে, এ কদিন যে তোমার টিকি দেখবার জো নেই। আজ তোমার নেমন্তন্ন। আজ বৌভাত। একটু সকাল সকাল যেয়ো কিন্তু।"

বীরেন্দ্র সুকুমারীর বৌভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। প্রজাপতির পরিহাস!

সন্তোষ সুকুমারীর সহিত এক ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

বীরেন্দ্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া সন্তোষ বলিল "বীরেনকে এখানেই ডেকে আন।"

সুকুমারী উঠিয়া যাইতেছিল। সন্তোষ তাহার হাত ধরিয়া বলিল "পালাও কোথায়? বীরেন বাঘভালুকের নাম নয়। আমারই একটি বন্ধু। তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো—ভারি আমুদে মজার লোক।"

সুকুমারীর মুখ লাল ও হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সন্তোষ মনে করিল বধূসুলভ লজ্জা।

বীরেন ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল সন্তোষ একখানি সোফার উপর বসিয়া, পাশে সুকুমারী দণ্ডায়মানা, তাহার বামহাতখানি সন্তোষের হাতের মুঠির ভিতর। বীরেন দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

সন্তোষ হাসিয়া বলিল "তোমার নামটাই শুধু বীরেন্দ্র! সাহস দেখছি এক তিল নেই। এস হে এস।"

বীরেন্দ্র একবার চকিতে সুকুমারীর দিকে চাহিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ারে বসিল।

সন্তোষ বলিল "এস বীরেন তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি।—ইনি—"

বীরেন বাধা দিয়া বলিল "থাক, সুকুমারীর সঙ্গে আমার পরিচয় তোমাকে করিয়ে দিতে হবে না। সুকুমারী তোমায় যা চেনে তার চেয়ে আমায় ঢের বেশি চেনে।"

সন্তোষ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল "তাই নাকি?" তারপর সুকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল তাহা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার সঙ্গে কেমন করে' পরিচয় হ'ল?"

বীরেন বলিল "সুকুর দিদি আমার বৌদি। আর শুধু কি তাই?—সুকু আমার বন্ধু, আমি একে যত ভালোবাসি তুমি জীবনে কখনো তত ভালো বাসতে পারবে কি না সন্দেহ। সত্যি কি না সুকুকেই জিজ্ঞাসা কর।"

সন্তোষ অবাক্ হইয়া একবার বীরেনের দিকে, আর একবার সুকুমারীর দিকে চাহিল। বীরেন দিব্য সপ্রতিভভাবে বসিয়া হাসিতেছে; সুকুমারী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়াছে; সন্তোষ গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল—বিবাহ করিয়া এমন বিপদে আর কেহ পড়িয়াছে কি? বেচারা একটি বৌ ঘরে আনিল, কিন্তু তাহার হৃদয়খানি আর একজনের কাছে বাঁধা! সন্তোষ বীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা যদি এতই ভালো বাস, তবে তুমি বিয়ে করলে না কেন?"

"হবার জো নেই ভাই, প্রজাপতির অভিসম্পাত—সুকু আমার স্বগোত্তর।"

এর পরে সন্তোষ যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। বীরেনই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "এই কথাটা আমি তোমায় বলে' ফেলা দরকার মনে করেছিলাম। একপ্রাণ প্রেম হৃদয়ে গোপন রেখে চোরের মতো তোমার অন্তঃপুরে গতায়াত করা আমার উচিত হ'ত না। সব বলে' আমি খালাস। এখন যদি তুমি বারণ কর আমি আর সুকুমারীর ছায়া মাড়াব না।" বীরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় সন্তোষের মুখের দিকে চাহিল।

সন্তোষ বীরেনের হাত ধরিয়া বলিল "যাও কোথায়, বোসো। তুমি যে অকপট আত্মপরিচয় দিলে এর পরে আমি তোমাকে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি নে। যদি তুমি আমাকে না-ই বলতে? তুমি অসঙ্কোচে আসবে, আমি থাকলেও, না থাকলেও—সুকু যে তোমার বন্ধু!" তারপর সুকুমারীর দিকে ফিরিয়া সন্তোষ বলিল "সুকু, তোমার বন্ধু তোমার জিম্মা, তুমি একে খাওয়াও। আমি একবার বাইরে দেখে আসি কে কে এল।"

বীরেন্দ্রের অকপট শুচিতায় ও সন্তোষের উদার বিশ্বাসে সুকুমারীর অন্তর ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ স্বামীর প্রতি পরিপূর্ণ

অনুরাগে তাহার বিবাহ সার্থক হইয়া উঠিল। সে স্বামীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বীরেন্দ্রের আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। এক বৎসর আগে বীরেন্দ্রকে খাওয়াইতে তাহার প্রাণ যেমন হর্ষ সরমে ভরিয়া উঠিয়াছিল, আজও তেমনি—আজ যেন আবার বীরেন্দ্রের সহিত তাহার নূতন করিয়া পরিচয় হইল।